অশিক্ষিত অনুসারী ও অযোগ্য আলেমদের মাঝে ইসলাম

লিখেছেন
শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ

অনুবাদ
হোসাইন আহমদ

প্রবেশিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর যিনি মানুষকে পড়তে শেখালেন, এবং মানুষের সম্মুখে অজানা বিষয়ের দুয়ার খোলে দিলেন। দুরুদ ও সালাম উম্মী নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি, যাকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছিলেন শিক্ষিত মানুষদের তাঁর পথে আহ্বানের জন্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ♦ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও শাশ্বত কেতাব এসেছে। মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে যাঁরা তার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলার পথে নিয়ে আসেন আপন নির্দেশের মাধ্যমে, এবং সরল পথ দেখান। (আল কোরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত: ১৫-১৬)

একজন মুসলিমের জন্য পীড়াদায়ক বিষয় হলো যখন সে দেখে তার অন্য মুসলিম ভাই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে, দিন দিন ক্রমাগত দুর্বল আর জ্ঞানহীন হচ্ছে। আর তার ভেতরে এ বোধ জাগ্রত হচ্ছে না যে, এ অধ:পতনের মূল কারন হলো ইসলামিক শারিয়াহ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তা পালনে অনিহা।

তারা এ ব্যাপারে বেখবর যে, ত্রুটিযুক্ত সেক্যুলার আইনের উপর তাদের অনমনীয় আনুগত্যই তাদের জীবনকে ধ্বংশ করেছে। তাদেরকে অপমান আর পতনের এই জায়গায় এনে ফেলেছে।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের মূর্খতা এবং আমাদের আলেমদের ব্যর্থতা ইসলামিক শরিয়াকে বিরানভূমি বানিয়ে দিয়েছে। আমাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাদের যোগ্যতার অভাব রয়েছে। প্রত্যেকটা মুসলিম কি জানে ধর্মের ব্যাপারে তাদের কি বাধ্যবাধকতা রয়েছে? জানলে হয়তো এটাকে পূর্ণ করতে সে ব্যর্থ হতো না; কার্যত এটার নীতি বাস্তবায়ন আর এর সেবায় তীব্রবেগে ধাবিত হত।

আমি মনে করি একজন মুসলিম তার ভাইদের জন্য সবচেয়ে বড় যে সেবা করতে পারে তা হল তাদেরকে ইসলামিক শরিয়া শিক্ষা দেয়া এবং তাদের সামনে সেই সব ধর্মীয় বিষয় উন্মুচিত করা, যা তারা জানে না ।

আমি এই সংক্ষিপ্ত রচনায় ইসলামিক আইনের মৌলিক কিছু উপাদান উপস্থাপন করেছি, যা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলিমের জানা উচিত। কিছু বিষয়ের সঠিক ভিউ দেখিয়েছি;যা নিয়ে কিছু অশিক্ষিত লোক ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। তারা এ বিষয়ের ওপর অযৌক্তিক ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্তাপন করেই যাচ্ছে। আমি আশা করব যারা সেক্যুলার শিক্ষা নিয়েছেন, তাদের জন্য এ লেখাটি কিছু ইসলামিক বিষয়কে স্পষ্ট করে দিবে। যা নিয়ে তাদের ভুল ধারনা রয়েছে। আমি এ-ও আশা করছি যে এটা আমাদের আলেমদের উৎসাহিত করবে তাদের পদ্ধতি বদলাতে এবং ইসলামের খেদমতের জন্য তারা নতুন এক প্রণালী অবলম্বন করবেন। কেননা সর্বশেষ তারাই রাসুলের উত্তরসূরি এবং আল্লাহর নবীর অনুসারী।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক হেদায়তের পথে নিয়ে আসুন।

লেখক।

প্রথম অধ্যায়

একজন মুসলিমের কী জানা উচিত

আমরা মুসলিমরা, ইসলামের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতে আনন্দবোধ করি। আমরা ইসলামের জন্য গর্বিত। তবে দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনুশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ। এর অনেক বড় বিষয়ও আমরা সহজে অগ্রাহ্য করি।

ইসলামের মূলনীতি

ইসলামের মূল উপাদান হলো-যেসব তত্ব এবং মতবাদ যা কোরআনে এসেছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাসুল সা.-এর মাধ্যমে। এইসব তত্ব আর মতবাদকে এককথায়

‘ইসলামিক শরিয়া’ বলা হয়। এভাবে ইসলামিক শরিয়া হল পবিত্র ঐক্য, বিশ্বাস, ঐক্যবদ্ধ ইবাদত, ব্যক্তিগত অবস্থা, অপরাধ, সাধারণ লেনদেন, প্রশাসন, রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয় আর ব্যবসার সমষ্টি যা ইসলাম প্রণয়ন করেছে।

ইসলামের প্রকৃত মন্ত্র হল তার আইন এবং আদেশ-নিষেধকে প্রয়োগ করা। কেননা ইসলাম ঠিকে থাকার কোন মুল্য নেই, যখন মানুষ এর মূলনীতি সম্পর্কে অবগত থাকবে না। তার দেখানো পথে ইবাদত করবে না। তার আইন বাস্তবায়ন করবে না। এই অর্থে, যে ইসলামিক শরিয়ার অমর্যাদা করল, অথবা তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল; প্রকারান্তরে সে ইসলামের অমর্যাদা এবং একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল।

জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ইসলামিক শারিয়া

ইসলামিক বিধি বিধান দুই ধরনের: এক.সেসব প্রত্যাদেশ যা দেয়া হয়েছে ধর্মীয় এবং অধ্যাত্মিক কারনে, যাতে ইবাদত ও বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো সন্নিহিত। দুই. রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা নীতি, সরকার ও সমাজ; এমনকি জাতিগোষ্ঠীর একক ও সম্মিলিত সম্পর্কের মত আইন রয়েছে। এতে সন্নিহিত রয়েছে নৈতিকতা, ভালো ব্যবহার, শাস্তিমূলক আইন, সাধারণ আইন, সাংবিধানিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বিষয়াদি। এভাবে ইসলাম মিলিত করেছে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকতাকে, মসজিদ আর রাষ্ট্রকে। এটা এমন এক ধর্ম যা আলিঙ্গন করেছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনকে সমভাবে। ঈমান আর বিশ্বাস হল ইসলামের একটি অংশ। এর পাশাপাশি সরকার হল এর দ্বিতীয় অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ সাহস করে বলতে পারেন, এটা এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উসমান ইবনে আফফান সত্যিই এ ব্যাপার নিয়ে বলেছিলেন, ” ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران

ইসলামের সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র সব আইনের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালের প্রসন্নতা পেতে সাহায্য করা। অতএব, সকল জাগতিক ক্রিয়াকলাপের সাথেই ইবাদতের প্রাসঙ্গিকতা জড়িত। যে কোন ইবাদত অথবা বেসামরিক, ফৌজদারি, সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিক্রিয়া এই জাগতিক জীবনে রয়েছে। যা হয়তো কোন কর্মের পূর্ণতা, একটি অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করা, জরিমানা আরোপ করা অথবা একটি দায়িত্বে আবদ্ধ হওয়া। এধরনের কাজের ফল যদিও এই পার্থিব জীবনে রয়েছে, তবে এর আরেক ফল রয়েছে পরকালের জীবনে। তার আসল পুরুষ্কার আখেরাতে।

যেহেতু শরিয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সুখী করা। তাই এটাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে পরিপূর্নভাবে বা এই অনুসরণ সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক হবে। কেননা এর একটি অংশ গ্রহণ আর অন্যটি বর্জন করলে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।

আইন ও বিধান সংবলিত কোরআনের যে কোন আয়াতের লঙ্ঘন দুটি জিনিস ডেকে আনে। একটি জাগতিক অন্যটি পরকালীন। যেমন- একজন ডাকাতের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। অথবা হাত কেটে দেয়া,

ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো, কিংবা নির্বাসন। এসব হলো দুনিয়ার সাজা। তবে এর সাথে পরকালে ভয়ানক শাস্তিও যুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঁঙ্গামা বাঁধাতে তৎপর হয়; তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে, অথবা তাদের একদিকের হাত এবং অন্যদিকের পা কাটা হবে; নতুবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের দুনিয়ার লাঞ্চনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি’। (আল কোরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩৩)

অন্যদিকে জঘন্য গুজব ছড়ানো। অথবা স্বতী-স্বাধী কোন মহিলার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, এগুলোর শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

‘যারা পছন্দ করে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’। (আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াত: ১৯)

তাছাড়া কোরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ♦ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ♦ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

‘যারা স্বতী-স্বাধী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধিকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে বিপুল শাস্তি। যেদিন তাদের হাত-পা এবং জিহ্বা সাক্ষ্য দিবে তারা যা করত সে ব্যাপারে। সেদিন আল্লাহ তাদের উচিত শাস্তি পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে আল্লাহ সত্য এবং স্পষ্টবাদী’। (আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২৩-২৫)

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে দুটি শাস্তি, প্রথমত দুনিয়ার শাস্তি। দ্বিতীয়ত পরকালের শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

‘হে মূমিনেরা! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে’। (আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৮)

আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

‘যে ইচ্ছাকৃত কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার দন্ড হলো জাহান্নাম, সে চিরকাল সেখানে থাকবে’। (আল কোরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ৯৩)

ইসলামিক আইনে এমন কোন বিচার যার সাথে পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি তা খুবই কম। কখনও যদি আমরা এমন কয়েকটি ঘটনার সাথে যুক্ত হই, তাহলে তা আল্লাহর বাণী দ্বারা নির্ধারিত হয়-

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ♦ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ♦ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

‘যে বিশ্বাস করে সে কি অবিশ্বাসীদের মতো? না, তারা একে অপরের মত নয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত । এটা হলো যে কাজ তারা করেছে তার অভ্যর্থনা। আর যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা হলো নরক। যখন তারা এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে, তখনই ফিরিয়ে দেয়া হবে তথায় এবং তাদের বলা হবে, ‘তোমরা নরকের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে’। (আল কোরআন, সূরা সেজদা, আয়াত: ১৮-২০)

কোরআনে বলা হয়েছে:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ♦ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

‘যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতেসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে’। (আল কোরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১৩-১৪)

এরকম বিধান সাংসারিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার জন্য দৈবাৎ রচিত হয়নি। এসব আসলে ইসলামিক আইনের এক সাধারণ যুক্তি- যে এই দুনিয়াকে প্রধানত একটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান হিসাবে বিবেচনা করে। যখন আখেরাতকে মনে করে পুরুষ্কার ও চিরস্থায়ী আবাস হিসাবে। এটা পরিগ্রহ করে যে দুনিয়াতে মানুষ তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং এই কাজের প্রতিদান সে কমপক্ষে পরকালে নিরন্তর পেতে থাকবে। যদি ভালো কাজ করে এটা তার কৃতিত্ব। মন্দ করলে এর প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। কিন্তু দুনিয়াতে একটি শাস্তি ভোগ করলেও এটা আখেরাতের শাস্তিকে রহিত কিংবা লঘু করবে না; যদি না মানুষ তাওবা করে।

ইসলামিক শরিয়া মানব তৈরি আইন থেকে স্বতন্ত্র। কেননা এটা ধর্মকে সংসারিক কাজের সাথেও মিশ্রিত করেছে। জাগতিক জীবনের কর্মবিধি প্রচার করে পরকালের জীবনের জন্য। এটাই সেই কারণ, যা আহবান করে মুসলিমদের এর শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ও সার্বজনিন জীবনে, সাফল্যে এবং দুঃখে বাস্তবায়িত করতে। মুসলিমরা তাদের শরিয়া অনুযায়ী এটা বিশ্বাস করে যে এভাবে সাড়া দেওয়া একধরনের ইবাদত। এটা তাদেরকে তাদের রবের আরও নিকটে পৌঁছে দিবে এবং তারা এর প্রতিদানে পুরুষ্কিত হবে। এধরনের বিশ্বাস সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সযোগীতা করে। যেখানে মানুষের তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কিন্তু এধরণের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আইন চিন্তাশীল মানুষের বিবেক স্পর্শ করে না। যেহেতু তারা এই আইন মানে না বা একমাত্র তখনি মানে যখন এই আইনী বিধান অনুযায়ি দন্ডিত হওয়ার ভয় থাকে। এভাবে দেখা যায় কেউ যদি কোন আইনের ফাক গলে ঝামেলা ছাড়াই অপরাধ করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নৈতিক অথবা ধর্মীয় কোনভাবেই তাকে দমানো সম্ভব হয় না। এ কারণে যেসব দেশ মানব তৈরি আইন দ্বারা পরিচালিত তাতে দ্রুততার সাথে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। নৈতিকতার অবক্ষয় হচ্ছে, শিক্ষিতের মধ্যে অপরাধের মাত্রা বাড়ছে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে চারিত্রিক বিভেদ বাড়ছে। আর অন্যদের চেয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই কৌশলে আইনকে এড়িয়ে যাওয়া অধিক সহজ।

অবিভাজ্য ব্যবহারিক আইন

ইসলামিক শরিয়া থেকে দেওয়া সকল আইন অবিভাজ্য। এটা নিছক এজন্যই নয় যে, একে ডিংগিয়ে যাওয়া ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অপবিত্র করে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এটা এজন্যও যে এখানে স্পষ্ট আইনি অনুশাসন রয়েছে, যা মানুষকে নিষেধ করে কিছু বিধানকে গ্রহণ ও কিছু বর্জনকে। আসলে শারিয়া সকল আইনের বাস্তবায়ন এবং এর উপর অকাট্য বিশ্বাস রাখাকে অপরিহার্য করে। এখান থেকে একটু বিচ্যুতিকে ঐশ্বরিকভাবে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কোরআনে বলা হয়েছে:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

‘তবে কি তোমরা কেতাবের আংশিক বিশ্বাস কর এবং আংশিক অবিশ্বাস কর। যারা এমন করে তাদের জন্য কোন বদলা নেই দুনিয়ার জীবনের দূর্গতি ছাড়া, এবং কিয়ামত দিবসে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে’। (আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ৮৫)

কোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যা নিষিদ্ধ করে ঐশ্বরিক আইনের এক অংশ মেনে অন্য অংশকে ছেড়ে দেয়াকে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ♦ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

‘নিশ্চয় যারা গোপন করে আমার নিদর্শন এবং হেদায়ত, যা আমি নাযিল করেছি মানুষের জন্য এবং কেতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পরও। তাদের প্রতি খোদার অভিসম্পাত এবং যারা অভিসম্পাত করে তাদেরও অভিসম্পাত। কিন্তু যারা তওবা করে, সংশোধন করে এবং (সত্য) বর্ণনা করে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিই; আমি তো ক্ষমাশীল দয়ালু’। (আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৯-১৬০)

এখানে ‘গোপন করা’র অর্থ হলো কিছু আইনের স্বীকৃতি দিয়ে কিছুকে অস্বীকার করা; কিছু আইনকে পালন করা আর কিছু আইন পালন না করা।

আবারো আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ♦ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

‘নিশ্চয় যারা গোপন করে কেতাবের কোন এক অংশ যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং অতি কম মূল্যে তা বিক্রি করে, তারা আগুন ছাড়া খাদ্য হিসাবে আর কিছুই গ্রহণ করে না; কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত: তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। আর তারা হল সে সকল মানুষ, যারা হেদায়তের বিনিময়ে বিপথগামীতা ক্রয় করেছে, এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি। অতএব তারা দোযখের ওপর কত বেশী ধৈর্য্যধারণকারী’। (আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৪-১৭৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ♦ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

‘যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে বিশ্বাস করেনা, এবং ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ এবং তার রাসূলের মধ্যে বিশ্বাসে তারতম্য ঘটাতে; আর বলে যে-‘আমরা কিছু অংশ বিশ্বাস করি এবং কিছু অংশ বিশ্বাস করি না’, এবং এর মধ্যবর্তী কোন পথ ধরতে চায়। আর তারা হলো প্রকৃত অবিশ্বাসী’। (আল কোরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ♦ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ♦ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

‘আর আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্বে অবতীর্ণ কেতাবগুলোর সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী (পরিবর্তন এবং বিকৃতি থেকে)। সুতরাং, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা দিয়ে বিচার-ফয়সালা করুন, তা ছেড়ে আপনি তাদের খেয়ালের অনুসরণ করবেন না। … আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে ফয়সালা করুন, এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না ও তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা কিছু আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের গোনাহ’র কিছু শাস্তি দিতে চাইছেন; আর মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত সময়ের বিচার কামনা করে? কিন্তু আল্লাহর চেয়ে বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বিচারক কে’? (আল কোরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৮-৫০)

ইসলামী শরিয়া পবিত্র ও বিশ্বজনীন

ইসলামী শরিয়া বিশ্বজনীন ও সার্বজনীনতায় গঠিত হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর উপর প্রেরিত হয়েছে। এটা এসেছে মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য। আরব-অনারব, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-সবার জন্য ইসলামী শরিয়া এসেছে। সকল পথ ও মতের মানুষের জন্য ইসলামী শরিয়া এসেছে। ইতিহাস আর প্রথার মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ইসলামী শরিয়া এসেছে।

ইসলামী শরিয়া এমন এক ব্যবস্থাপনা, যা প্রতিটি পরিবার, গোত্র, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য এমন এক বিশ্বজনীন আইন- যা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তৈরি করতে অক্ষম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

‘বলুন, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।’ (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

‘তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়ত ও সত্যবিশ্বাস দিয়ে, যেন অন্যান্য বিশ্বাসের উপর এই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।’ (সূরা তাওবাহ, আয়াত: ৩৩)

ইসলামী শরিয়া নিখুঁত ও চিরস্থয়ী

ইসলামী আইন আল্লাহ পরিপূর্ণ এবং সার্বজনীন করে পাঠিয়েছেন। এটা এসেছে খুব কম সময়ের মধ্যে। রাসুলের মিশনের প্রথম দিন থেকে নিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা এসে শেষ হয়। অথবা সেদিন পর্যন্ত এসেছিলো যেদিন এই আয়াত নাজিল হয়।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় শরিয়াকে পরিপূর্ণ আর চিরস্থায়ীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষভাবে তখন থেকে যখন অন্য আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিলো মুহাম্মাদ সা. হলেন শেষ নবী।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

‘মুহাম্মদ সা. তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।’ (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪০)

কেউ যদি ইসলামী শরিয়াকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে, তাহলে সে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে এটা পরিপূর্ণ। এতে কোন খুঁত নাই। এতে রয়েছে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবনের বিষয়গুলোর সমাধান। সব প্রকার লেনদেন থেকে শুরু করে সরকার, প্রশাসনিক বিষয়, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়- যা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত এবং যুদ্ধ আর শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলামী শরিয়া কোন সময় কিংবা কোন স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা একটি জাতির জন্য বাস্তবায়নযোগ্য এবং অন্য জাতির জন্য উপযোগী নয়- এমনতরও নয়। এটা অনন্তকালের জন্য প্রযোজ্য। সব কালের প্রয়োজন মেটাতে তা সক্ষম। দুনিয়াতে যতক্ষণ একটি প্রাণও বাকী থাকবে এর কার্যকারীতাও থাকবে।

ইসলামী শরিয়াকে আজ সাইডলাইনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা এজন্য নয় যে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে, এটা বদলানো প্রয়োজন। ইসলামী শরিয়ার ভিত্তি খুবই মজবুত। তা যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ের উপযুক্ত। এটা কখনো বদলায় না, এটা মানুষের তৈরি আইনের মত বাতিল হয় না।

তুলনামূলক বর্ণনা

আমরা জেনেছি ইসলামী আইন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিচল এবং পরিপূর্ণ হয়ে নাজিল হয়েছে- যে কোন সমাজ যে কোন পর্যায়ের জন্য। কিন্তু মানুষের তৈরি আইন তার বর্তমান লেভেলে সীমাবদ্ধ । সমাজ যে আইন তৈরি করে প্রথমত তা অনেক দুর্বল হয়, কিন্তু পরবর্তীতে সমাজের উন্নতির অনুপাতে এটাও উন্নতি করে।

প্রত্যেক কালে যখন সমাজে উন্নতির ঢেউ আসে, পৃথিবীর উন্নতির ধারা বদলে যায়। সমাজ তখন আইন ইস্যু করে তার প্রতিবিধান করে। এটা সেই সমাজ যা নতুন আইন তৈরি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিবিধান এবং প্রস্তুত করে।

সমাজ তার প্রয়োজনে আইনের ধারা পরিবর্তন করে। এসব আইন নির্ভর করে সমাজ ও উন্নতি উপর। মোটকথা সিভিলাইজেশনের সাথে তার সম্পর্ক।

ইসলামী আইন আর মানুষের তৈরি আইন নিয়ে আলোচনার পর আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইসলামী আইন ও মানব তৈরি আইনের চরিত্রের মধ্যে আমূল ব্যবধান আছে।

ইসলামী আইন যদি মানব তৈরি আইনের মত বিকশিত হত, তাহলে তা আধুনিক মতবাদকে গ্রহণ করতে পারত না। বর্তমানে প্রচলিত মানুষের তৈরি আইন ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠার প্রায় হাজার বছর পর তৈরি হয়েছে।

মৌলিক পার্থক্য

ইসলামী শরিয়া ও মানব তৈরি আইনের মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমত** ঃ ইসলামী আইন উৎসারিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অন্যান্য আইন মানুষের তৈরি। ইসলামী আইনের প্রত্যেক ধারা তার প্রণেতার অবদানের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায়। অন্যদিকে মানুষের তৈরি আইনে সীমাবদ্ধতা থাকে, দুর্বলতা থাকে, মনুষ্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। সে কারণে, এই আইন সবসময় বদলায় এবং বদলাতে সে সমর্থ। যাকে আমরা বলি, বিধানিক বিবর্তন। যা সামাজিক বিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে। দুটি আইনের উদ্যেশ্য সমান। কিন্তু ইসলামী আইন কখনো প্রতিস্থাপন কিংবা বদলানোর বিষয় নয়। যুক্তি তর্কে বললে, ইসলামী আইনের বিশেষত্ব হলো-

(ক) এই ব্যবস্থাপনার নীতি হল, এর ধারাগুলোতে এমন স্থিতিস্থাপকতা এবং বিশ্বজনীনতা থাকবে- যা সমাধান দিবে মানব সমাজের সকল প্রয়োজনকে। সময়ের ব্যবধান, সামাজিক বিবর্তন এবং মানুষের সংখ্যার আধিক্য ও বিচিত্রতায় প্রয়োজন মেটাবে সকলের।

(খ) এর নীতি এবং ধারা অবশ্যই নিখুঁত হবে। ব্যাপক হবে। যে কোন কাল ও সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে তার সমস্যা হবে না।

সত্যিকারার্থে বর্ণিত বিষয়গুলোর যৌক্তিক চাহিদা মেটানো ইসলামী শরিয়ার সহজাত কাজ। এর নীতি ও বিধান হল বিশ্বজনীন। এই আইনের গভীর ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি প্রায় ১৩ শ বছরের চেয়েও বেশী। এ সময়ের মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেকবার পাল্টিয়েছে। মতাদর্শ এবং বিজ্ঞানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইসলামী শরিয়া পাল্টায়নি। মানুষের তৈরি আইন সর্বদা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এটা কখনো ভবিষ্যতের ধারনা দিতে পারে না। যদিও এটা অতীত ধারণ করে।

অন্যদিকে ইসলামী আইন আল্লাহর তৈরি। এটা ধারণ করে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা। তাঁর পরিপূর্ণতা, তাঁর মহানুভবতা। এর মধ্যে অস্থিত্ব আছে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের। এটা প্রণীত হয়েছে সকল জ্ঞানের অধিকারী, সকল ক্ষমতাবান আল্লাহর এমন এক ব্যবস্থাপনায়- যা বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল সময়ে সমানভাবে খাপ খাইয়ে নিবে।

দ্বিতীয়ত: আইন হল অস্থায়ী নিয়ম যা সমাজ দ্বারা অভিনীত। বর্তমান বিষয় পরিচালনা ও সময়ের প্রয়োজন মেটাতে আইনের উদ্ভব। এইভাবে তারা সমাজের উন্নতির সাথে তাল মেলাতে না পেরে পেছনে থেকে যায়। অথবা সর্বোচ্ছ তারা ওই মানে থাকে যখন তা ইস্যু করা হয়েছিল। সমাজের নতুন নতুন ক্রমবিকাশ ধারণ করার জন্য এটা দ্রুত পরিবর্তন না করলে অল্পদিনের মধ্যে তা

পশ্চাৎপদ আইনে পরিণত হয়। সমাজের বর্তমান অবস্থার সাথে অস্থায়ীভাবে (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) আইন মানানসই হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে তারও পরিবর্তন করতে হয়।

অপরদিকে ইসলামি আইন হল চিরস্থায়ী আইনের সমষ্টি। যার অবস্থান, নীতি ও কল্পনার অনেক উর্ধে। আল্লাহর মাধ্যমে যার উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের তৈরি আইন নিজেদের সাথে খাপ খাওয়ানো জন্য ঘন ঘন বদলাতে হয়। বিচিত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুখে একে সাইজ করতে হয়। এরকম ক্রমাগত পরিবর্তন দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকায় মনুষ্য রচিত আইন সেইসব আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা ইসলামি শরিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব বিশাল রুপান্তরের পরও ইসালামি শরিয়ার নীতি ও শ্রেষ্ঠত্ব উপযুক্ত হিসাবে এখনও বহাল আছে। ইসলামি শরিয়া প্রমাণ করেছে, যে কোনো কালের যে কোনো সমাজের উন্নতি ও প্রগতির সাথে চলতে সে সক্ষম। মানবতার সহজপ্রবৃতির জন্য সে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং মানবতার নিরপত্তা বিধানের জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই চমৎকার সত্য ইসলামি শরিয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হয়েছে। এভাবে তাকালে দেখা যায় ইসলামি অনুশাসন এখনও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে আপনি পরামর্শ করুন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

এবং (তারা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সমাধা করে। (সূরা শূরা, আয়াত: ৩৮)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা একজন অপরজনকে সহযোগীতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যকে সহযোগীতা করবে না। (সূরা মায়িদা, আয়াত : ২)

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন: لا ضرار ولا ضرار فى الاسلام "ইসলাম নিজের এবং অন্যের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ করেছে"। কুরআনের এই বক্তব্য এবং ইসলামি শরিয়ার ঐতিহ্য কত সাধারণভাবে এর বিশালতা প্রকাশ করে। এটা এমন নমনীয়তা প্রকাশ করেছে যা অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এটা এমন এক পরামর্শ নীতি প্রতিষ্টা করে-যা একটি সরকারের মূল বুনিয়াদ। যার কারণে সমাজের উপর কোনো ক্ষতি কিংবা অবিচারের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে সেখানে ভালো এবং

ন্যায়ের প্রবণতা বেড়ে যায়। এসব নীতির কারণে ইসলামি শরিয়া এমন এক উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মানুষের পক্ষে সেখানে পৌঁছা কোনো কালেই সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত : শরিয়ার উদ্দেশ্য হল সমাজকে পথ দেখানো, সুশৃঙ্খল করা এবং সঠিক নেতৃত্ব তৈরি করা। আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ পৃথিবী গড়ে তোলা। এ কারণে যখন তা প্রতিষ্টা লাভ করছিল, তার গুণাগুণ ও রসদ ছিল সে সময়ের চেয়ে অনেক অনেক অগ্রগামী। এখনও আমাদের বর্তমনের চেয়ে এটা অনেক উন্নত। ইসলামি শরিয়ায় এমন সব নীতি ও থিউরীর সম্মিলন ঘটেছে, যা অনুধাবন করতে অমুসলিম সমাজের হাজার বছরের চেষ্টা ও সাধনা লেগেছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর তারা এই আইনের হাকিকত জানতে ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা এই শরিয়া আইন প্রকাশ করে গোটা মানবতাকে অনর্থক সময় ও শক্তিব্যায় থেকে রক্ষা করেছেন। এই আইন দৃষ্টান্তমূলকভাবে পরিপূর্ণ এই ধারণার সাথে যে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক ও সম্মানজনক পথের দিকনির্দেশনা দেয়া। মানুষকে উন্নতির পথ দেখানো, যাতে সে একটি পবিত্রতম মান অর্জন করতে সচেষ্ট হয়; যা তার শরিয়ার চাহিদা।

সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতেই সাধারণ আইনের উৎপত্তি। সমাজকে পথ দেখানো কিংবা পরিচালিত করার জন্য তা প্রণীত হয়নি। বিষয়টি ব্যাখ্যা দেয় আমাদের এই কথার যে, আইন সমাজের উন্নতির সাথে পিছিয়ে পড়ে। রাষ্ট্র যখন নতুন মতবাদ গ্রহণ করতে শুরু করে আইন তখন সমাজকে পথ দেখাতে এবং একসঙ্গে বিন্যস্ত করতে নতুন ধারা আরোপ করে। জনগণকে একটি নির্দিষ্ট মতবাদের দিকে পথনির্দেশ করতে এবং নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে আইনি সংশোধনী আনতে থাকে। এই অবস্থা রাশিয়া, জার্মানি, তুরষ্ক, ইতালি এবং অন্যান্য বহু দেশের। এভাবে মানুষের তৈরি আইন অবশেষে তাই গ্রহণ করতে আসে যা ইসলামি শরিয়া ১৩ শ বছর পূর্বে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সাধারণ আইনের ওপর ইসলামিক শরিয়ার প্রাধান্য

উপরের আলোচনা থেকে হয়তো আমরা অনুমান করতে পেরেছি, ইসলামি শরিয়া মানুষের তৈরি আইনের উপর প্রধানত তিনভাবে প্রাধান্য পায়-

পরিপূর্ণতা : ইসলামি শরিয়া মানুষের তৈরি আইনের ওপর পূর্ণতার ব্যাপারে প্রাধান্য রাখে। অর্থ্যাৎ, এই আইন নিঁখুত এবং পরিপূর্ণ সকল আইনি ধারা ধারণ করে। জুডিশিয়াল সিদ্ধান্তের প্রতিটি পর্যায়ে যার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান, সাধারণ ভবিষ্যত এবং দূরবর্তী ভবিষ্যতে মানব সমাজের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় ধারণা দেয়।

শ্রেষ্ঠত্ব : ইসলামি আইনের নীতি সবসময় সামাজিক মর্যাদার উপরে অবস্থান করে। মানুষের মর্যাদা যতই উপরে উঠুক না কেন, যে কোন বিষয়বস্তুর ব্যাপারে শরিয়া নিজের উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে.

স্থায়ীত্ত : ইসলামি আইন মনুষ্য রচিত আইনের মতো নয়। তার বিশেষত্ব হল তার অপরিবর্তনশীলতায়। যেহেতু তার মৌলিক ধারাগুলো পরিবর্তন ও ঘষামাজার কোন বিষয় নয়। যাইহোক, এর ভা-ার প্রতিটি সমাজ ও কালের জন্য অতুলনীয়ভাবে উপযোগী।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের কাজকে তদারকি করার জন্য ইসলামি আইন মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রণীত হয়েছে। এটা প্রণীত হয়েছে মানুষের সব জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসাবে। তবে ইসলামি আইন মনুষ্য রচিত আইনের মতো আংশিক ও সম্পূরক কোন বিষয়ের উপর বিস্তারিত ধারা দেয়নি। কিন্তু সাধারণ প্রাণবন্ত বিষয়ে স্বর্গীয় বক্তব্য দিয়ে সেই সক্ষমতা অর্জন করেছে। এমনকি যখন কোন সম্পূরক বিধান উল্লেখ করেছে তা এজন্য যে এই ইস্যুকে মৌলিক বিধান হিসেবে ধরা হয়েছে; আর তার অভ্যন্তরে ছোটোখাটো প্রশ্ন চলে এসেছে।

ইসলামি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক আদেশ ইসলামি আইন-বিধানের সাধারণ ধারাকেও যথার্থভাবে বিবেচনায় আনে । তার স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যে তার ধারণা প্রতিফলিত হয় এবং তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে। শরিয়ার এইসব ভিত্তির উপর এর বৈধ অবয়ব তৈরির জন্য আইনজ্ঞ ও আইন প্রণেতাদের হাতে দায়িত্ত ন্যাস্ত করা হয়েছিল। যাতে এই স্পষ্ট বিধান অনুযায়ী প্রারম্ভিক আইন প্রণয়ন করা হয়। যা খুঁটিনাটি ও সম্পুরক ইস্যুকে নিয়ে আসবে এবং যা ইসলামের দেয়া মৌলিক বিধানের পরিধির মধ্যে থেকে হবে।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে আইন প্রণয়নের একমাত্র পদ্ধতি হল যে, তার নিজের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব, পরিপূর্ণতা ও অপরিহার্যতাকে বজায় রাখবে। তার মতবাদ ও মূলনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য থাকবে। সমাজে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দিবে। ন্যায়বিচার ও সমতা নিয়ে আসবে এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে মানবকল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত করবে। এভাবে তাদেরকে অগ্রগতি ও উৎকর্ষতার পথের প্রতিযোগীতায় উৎসাহিত করবে। স্থায়ীত্ব এবং সংজ্ঞায় এই বিষয়টি জরুরী। কোন সাময়িক ঘটনার উপর কোন বিধান নির্ধারিত হবে না; যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে বিধানও পাল্টে যাবে।

শাসকের আইন প্রণয়নের অধিকার

যদিও ইসলামি শরিয়া শাসককে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, কিন্তু তা অবাধ অধিকার নয়। আদতে, এটা এমন অধিকার-যা সীমাবদ্ধ। ইসলামি শরিয়া শাসককে এই শর্তে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, যে শাসক যে আইন প্রণয়ন করবে তা অবশ্যই ইসলামি বিধানের সাধারণ মূলনীতি, চেতনা ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অতএব এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আইন প্রণয়নের বৈধতাকে দুটি শ্রেণীতে আবদ্ধ করে-

(ক) নির্বাহী আইন : এর উদ্দেশ্য হবে ইসলামি আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয়া। এই পরিস্থিতিতে, প্রণীত আইন তখন সেসব বিধানে রুপ নেয়, যা বর্তমান সরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের দিক নির্দেশের জন্য ইস্যু করে। এই উদ্দেশ্যে যে, এটা সংশ্লিষ্ট আইনের নির্ণায়ক বা সহযোগী হিসেবে কাজ সম্পন্ন করবে।

খ) প্রশাসনিক আইন : এই আইনের উদ্দেশ্য হল সমাজকে সংঘটিত করা এবং ইসলামি আইনের আলোকে সমাজের প্রয়োজন মেটানো। সাধারণত, বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত এই আইন প্রণয়ন করা হয় না। এই আইন তখন প্রণয়ন করা হয়, যখন শরিয়ায় শাসন করার জন্য তুলনামূলক কোন বিধান থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন করলে শাসকের প্রণীত আইন অবশ্যই মূল বিধানের মৌলিক মূলনীতি ও চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

শাসক নিজের সীমা অতিক্রম করলে

এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত যে, শাসকের সকল কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধতা পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামি আইন কাঠামোর মধ্যে থাকবে। ইসলামি শরিয়ার বিচারিক সিদ্ধান্ত ও চেতনার সঙ্গে তাদের কাজ সংগতিপূর্ণ হতে হবে। একমাত্র তখনই শাসক তার অধিকার অনুযায়ী কাজ করছে বলে ধরা হবে এবং তাকে সবার মেনে চলতে হবে। কিন্তু শাসক যদি এমন আইন ইস্যু করে, যা শরিয়া আইনের বিপরীত, তখন তার কাজ ও নীতি বিতর্কিত এবং অবৈধ হয়ে যায়। এই বক্তব্যের ভিত্তিমূল হল কুরআনের আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে

তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি উপস্থাপন কর। (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন-তার মীমাংসা আল্লাহর কাছে। (সূরা শূরা, আয়াত : ১০)

এভাবে আল্লাহ তার নিজের আনুগত্য, তার নবীর আনুগত্য এবং শাসকের আনুগত্য আমাদের উপর অপরিহার্য করেছেন। এই আনুগত্যেও নির্দেশ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এই নির্দেশ নবী কিংবা শাসক দেননি। এখন যদি শাসক আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, তাহলে সে আমাদের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। সে আমাদের উপর বিশ্বস্ততা কিংবা আনুগত্যের আশা করতে পারে না। তখন তার আইনকানুন এবং কর্তৃত্ব অবৈধ হয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল (সা.) এর তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেন:

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخ

“সৃষ্টির কোন আনুগত্যই পালন হবে না স্রষ্টার (আল্লাহ) অবাধ্যতার মাধ্যমে”।

এবং

إنما الطاعة فى المعروف

"শুধুমাত্র ভাল কাজেই আনুগত্য করা যাবে"

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة

“তাদের কেউ তোমাদেরকে গোনাহর আদেশ করলে তাতে তাদেরকে মানা এবং শুনার কোন অনুমতি নেই”।

শাসক কি তার সীমার ভেতর কাজ করছে?

গত শতাব্দীর পর, বেশিরভাগ মুসলিম দেশে শাসকরা বিভিন্ন আইনি বিষয়ে এমন সব ধারা অনুসরণ করছে, যার সমান প্যাটার্ন ইউরোপীয় দেশগুলোও অনুসরণ করে। বাস্তবতা হল তারা ইসলামি শরিয়ার কোন রেফারেন্স ছাড়াই ইউরোপের সাংবিধানিক, অপরাধ, দেওয়ানি, বাণিজ্যিক

এবং অন্যান্য ধারাগুলোর অনুসরণ করছে। যদিও নামমাত্র কিছু বিষয়ে তারা শরিয়াকে অনুসরণ করে। যেমন-ওয়াকফ এর ক্ষেত্রে।

বিষয়টি স্বীকার করা শুধুমাত্র ভদ্রতা হবে এই অর্থে যে, এই ধারাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ধারা ইসলামি শরিয়ার মূলনীতির সাথে খাপ খায়। এসব ধারা তার নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে না। কিন্তু একথা বলা অন্যায্য নয় যে, এই ধারাগুলোর অধিকাংশই আমাদের শরিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এগুলো আমাদের শরিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন-এসব ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্বন্ধকে বৈধতা দেয়, মদপানের অনুমতি দেয়,যা ইসলামে প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এখানে আমি কিছু মুসলিম দেশের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যারা স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় আইনকে গ্রহণ করেছে। তবে এই দেশগুলোর ইসলামি শরিয়ার বিরুধীতা করা আসল উদ্দেশ্য নয়। 1883 সালে প্রণীত ইজিপশিয়ান প্যানেল আইনের চেয়ে ভালো দলিল আর কিছু হতে পারে না। যেখানে আর্টিকেল 'আই' ব্যাখ্যা করেছে -

“এটা সরকারের বিশেষ ক্ষমতা যে, যারা জননিরাপত্তায় বাঁধা সৃষ্টি করবে সেসব ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপ করা হবে। এ ধরণের অপরাধ এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তা সরাসরি শাস্তির উপযুক্ত। তদ্রুপ এই আইন শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা বাস্তবায়নের অধিকার বৈধ শাসককে দিয়েছে। কিন্তু কোন মাত্রার কোন মামলায় যেন একজন ব্যক্তির ইসলাম স্বীকৃত আইনী অধিকার হরণ না করে।”

এই ধারাটি নকল করা হয়েছিল ১৮৫৩ সালে জারি করা তুর্কীয় আইন থেকে।

আমার মতে, অতীত বা বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের শাসক, কখনও ইসলামি আইনের বিরুধীতা করার চিন্তা করেনি। অথচ এ ধরণের দেশের অনেক আইনই ইসলামি শরিয়ার মূলনীতির বিপরীতে প্রণীত। এই আপাতবিরোধীতার কারণ হল, এইসব আইনের লেখক হয়তো ইউরোপীয়ান, ইসলামী শরিয়া সম্পর্কে যাদের নূন্যতম ধারণা নেই। অথবা এমন মুসলিম যারা ইউরোপীয়ান আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছে; কিন্তু ইসলামি শরিয়ার সাথে তারা নিজেদের পরিচয় ঘটায়নি।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ার ওপর আইনের প্রভাব

মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় আইন আসার ফলশ্রুতিতে স্পেশাল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। এই কোর্টগুলোর বিচারক যারা নিয়োগ পেয়েছিল, তারা হয়তো ইউরোপীয়ান, অথবা দেশীয় এমন শিক্ষাবিদ-যাদের ইসলামী আইন সম্পর্কে নূন্যতম পড়াশোনা নেই। নতুন স্পেশাল কোর্ট সবধরণের

বিচারের ক্ষেত্রে নিজেদের আইনগত কর্তৃত্বের অধিকার নিজেদের এখতিয়ারাধীন করে। এই এখতিয়ার, কার্যত ইসলামি শরিয়াকে প্রত্যাখ্যান ও নিস্ক্রিয় করে দেয়। বিশেষ করে যখন নতুন কোনো প্রতিষ্ঠিত কোর্ট নিজস্ব আইন ছাড়া অন্যকোনো আইন প্রয়োগ করে না।

তাছাড়া, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন আইনের ফিলোসফি শিক্ষা দিতে বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এ ধরণের স্কুলগুলোতে তারা স্বাভাবিকভাবে ইসলামি শরিয়া উপেক্ষা করে ইউরোপীয় আইনের ধারাগুলো শিক্ষা দিতে থাকে। লোকদেখানো দু একটি বিষয় ছাড়া ইসলামি শরিয়ার আর কোনো বিষয় সেখানে স্থান পায়নি। যেমন-ওয়াকফের বিষয় তারা শিক্ষা দিত। এ ধরণের আচরণ একটি দুঃখজনক উপসংহারে পৌঁছায়। যেহেতু প্রায় সব আইনজীবি, যারা শিক্ষিতশ্রেনীর মধ্যে উচ্চপর্যায়ের ছিল, তারা ইসলামি আইনের নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। যা অতি দূর্ভগ্যজনক। কারণ, তাদের এই মূর্খতা তাদের ধর্মের বিচারব্যবস্থা ও বিধানের ব্যাপারে মূর্খতার সামীল। যেটা সেই সকল দেশের ধর্ম, যারা নিজেদের ইসলামিক দাবি করে। তাদের এই অজ্ঞতা ইউরোপীয়ান আইনের দূর্বল ধারাকে প্রবর্তন ও ইন্টিগ্রেশন করতে পরিচালিত করেছে। যদিও তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ার প্রকাশিত ব্যবস্থার চেয়েও ভিন্ন ছিল। যেমন-মিশরীয় প্যানেল আইনের মতে, তার সকল ধারা প্রয়োগ হবে এমনভাবে যেন, কোনোভাবে ব্যক্তির ইসলামি শরিয়া প্রদত্ত অধিকারের কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু এই জোরালো শর্তের পরেও, মিশরীয় আইনবিদরা কোনো প্রয়োজন মনে করেনি, ইসলাম ঘোষিত সেসব খুঁটিনাটি অধিকারের সাথে নিজেদের পরিচয় ঘটাতে। তারা তাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ রেখেছে, ব্যক্তির অধিকার শিক্ষায়-যা ফ্রেঞ্চ লিগ্যাল সিস্টেমে আছে এবং যা কিছু ফ্রেঞ্চ জুরিরা ব্যাখ্যা করেছে তার মধ্যে। ফেঞ্চ আইনের ভিত্তির উপর সবকিছুর বৈধতা যাচাই করেছে। আর এতে মিশরীয় আইনবিদরা দুটি ফ্যাক্টরে প্রভাবিত হয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

প্রথমত: তারা ইসলামি শরিয়া শিক্ষা করেনি। এর মূলনীতি ও রসদের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না।

দ্বিতীয়ত : তারা নিজেদের ইউরোপীয় আইনবিদদের রুল ও অভিমতের ওপর বেঁধে ফেলেছে। বিশেষভাবে ফ্রেঞ্চদের কাছে; ফ্রেঞ্চরা যা অনুমোদন করেছে, তারা তাই অনুমোদন করেছে। তারা যা নিষিদ্ধ করেছে, এরাও তাই নিষিদ্ধ করেছে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে, ইউরোপীয় আইনবিদরা ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ মূর্খ।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়তের ওপর আইনের প্রভাব

যখন মানব রচিত আইনকে গ্রহণের কারণে ইসলামিক শরিয়া ব্যবহারিকভাবে অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই শরিয়ার ওপর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব আইনের কোনোই প্রভাব নেই। ইসলামি

শরিয়ার বিধান ও রুলগুলো এখনও বৈধতার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। এটা যেকোনো ব্যাপারে লাগাতে চমৎকার উপযুক্ত। আইন ও বিধানশাস্ত্রের একটি বুনিয়াদী নিয়ম হল-কোনো বিধানই তার সমমান অথবা এরচেয়ে উন্নত বিধান ছাড়া রহিত কিংবা বিলোপ করা যায় না। অন্যকথায়, আইনি বিধান কখনও বিলুপ্ত করা যাবে না, যদি না বিধানদাতা এর সমমান অন্য বিধান প্রণয়ন না করেন। অথবা এমন একটি কতৃপক্ষ, যারা সমান পর্যায়ের বিধানিক এখতিয়ার রাখেন। অথবা এমন ক্ষমতাবান বিচারব্যবস্থা, যা প্রাথমিক বিধানকর্তার অনুরুপ।

সুতরাং, ইসলামি শরিয়াকে রহিত করার মত একমাত্র বিধান হবে কোরআনের আয়াত কিংবা সুন্নাহ। কেননা, আমাদের শরিয়া হল কোরআন ও রাসূলের হাদীস। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও অতিরিক্ত কুরআনের আয়াত আসতে পারে না। কেননা তা আসার সমাপ্তি ঘটেছে মুহাম্মদ সা.-এর সাথে। আর কখনও সুন্নাহও আসবে না, কারণ রাসূল সা. মৃত্যুবরণ করেছেন। যাইহোক, কুরআন ও সুন্নাহর মতো সমমানের আইন জারি করার মতো বৈধ কর্তৃপক্ষ হওয়ার সাহস কেউ রাখে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতো আইনের কর্তৃপক্ষ হওয়ার এবং সমান বিধান জারি করার চেষ্টা করেনি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের শাসকদের আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নাই। কিন্তু শাসন করার ক্ষমতা আছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামী শরিয়া স্পষ্ট এবং অকাট্য। আর তা ওহী নাযিল শুরু হওয়া থেকে রাসূল সা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে ছিল।

শরিয়া এবং সাধারণ আইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব

এইসব দৃষ্টান্তে যেখানে মানুসের তৈরি আইনের ধারা ও ইসলামী শরিয়ার নির্দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাতে ইসলামী শরিয়া ব্যবহার করা উচিত। মানব তৈরি আইন নয়। আর এটা তিনটি জোরলো কারণে করতে হয়-

প্রথমত : শরিয়ার বিধানগুলো এখনও অকাট্য এবং যে কোনো ভাবে তা কখনও বিলুপ্ত করা যায় না, যা পূর্বে বলা হয়েছে। যেখানে মানুষের তৈরি আই বাতিলযোগ্য। তার মানে হল, মানুষের তৈরি আইন থেকে ইসলামী শরিয়ার সেসব প্রশংসনীয় ধারাগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত : শরিয়ায় মানদন্ড হল, যা কিছুই তার ধারার বিপরীত পরিচালিত হয়, তা বাতিল। তা প্রতিপালন এবং মানা উচিত নয়। এই সীমাবদ্ধতায় যেকোনো আইন শরিয়ার বিপরীতে গেলে তা অকার্যকর ও বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত : ঠিক তেমনি আইনের প্রাথমিক মূলনীতি অনুসারে যেসব আইন শরিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে যাবে, এবং তদনুসারে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাবে, তা আপনা আপনি বাতিল ও অকার্যকর হয়ে যাবে।

পরস্পরবিরোধী আইন কিভাবে বিপথগামী হয়

সমাজের প্রয়োজনে পূরনে মূলত মানব তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সকল ব্যক্তির মাঝে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দল বা সংঘ গড়ে তোলা। সমাজের অন্যতম একটি প্রধান প্রয়োজন হল তার ধর্মমত, বিশ্বাস এবং সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করা। ইসলামী দেশগুলোতে সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামী ভিত্তির উপর এবং সংখ্যাগুরুদের বিশ্বাস ও ধর্ম হল ইসলাম। এ ধরণের সমাজে যেকোনো আইনই প্রবর্তন করা হোক না কেন তা পূর্ণরুপে ইসলামী শরিয়ার সাথে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে হওয়া উচিত। দূর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমান মুসলিম দেশসমূহে যে আইনগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে এই অবস্থা নেই। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, এর অনেকগুলো ইসলামী শরিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত।এইভাবে আইনের স্খলন ঘটে এবং আইন যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়। এই পরস্পরবিরোধী আইন একসাথে তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে।

আমরা যদি ইসলামের নীতির সাথে নিজেদের পরিচিত করি, তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, কিভাবে এই সমান বিধান ইউরোপকে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তির মধ্যে শান্তি অনুধাবন করতে পথ নির্দেশ করেছিল। কিন্তু মানব তৈরি আইন একেকটি ইসলামী সমাজে প্রধান মর্মান্তিক উপাদান যা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। তার সদস্যদের অপমান করে এবং যা তাদের মনে তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে উদ্দিপ্ত করে। এটা সংখ্যাগুরুদের এই আইনের প্রতি বৈরি করে তোলে। অস্থিরতা, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে প্ররোচনা দেয়। এ ধরণের ঘটনা ব্যখ্যা করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে-

প্রথমত : যেসব আইন ইসলামী শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক তা গ্রহণ করতে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে নিষেধ করে। যেকোনো ধারা, যা শরিয়ার বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্য রাখে না, অথবা তার স্বাভাবিক রুল ও চেতনার সাথে মিলে না-তা ইসলাম কুরআনের আয়াত ধারা স্পষ্টত নিষেধ করেছে। সেসব আয়াতে আল্লাহ পরিস্কারভাবে দুটি বিকল্প দেখিয়েছেন, যে হয়তো মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূলের সা.-এর ডাকে সাড়া দিবে এবং তার অনুসরণ করবে, যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। নতুবা নিজেদের কামনা ও অভিলাষের অনুসরণ করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ

আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৫০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহর মুকাবিলায় তারা আপনার কোনই উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের ওলী (বন্ধু , অভিবাবক, সহযোগী)। আর আল্লাহ পরহেযগারদের ওলী। (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত: ১৯)

এছাড়া কুরআনে এসেছে:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না। (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৩)

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ কখনও কোনো বিশ্বাসী মুসলিমকে তার আইন ব্যতীত অন্য আইন মেনে নিতে অনুমোদন দেন না। অথবা যে কোনো বিধি যেটা তার বিধানের সাথে বেমানান। আসলে মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন, তার দেওয়া সিদ্ধান্ত ছাড়া যে কোনো জুডিশিয়াল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে। এই বিবেচনায়, অন্যসব আইন মেনে নিলে দোযখের ভয়ানক আযাব পেতে হবে এবং তা শয়তানের পূজার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

তুমি কি তাদের দেখ নাই, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে। অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়? (সূরা নিসা, আয়াত: ৬০)

এর অর্থ হল, আল্লাহ যা প্রকাশ করেছেন এবং রাসূল সা. যা বলেছেন তা ব্যতীত বিচারের জন্য আইন প্রনয়ণ করা হল; শয়তানের কুমন্ত্রণা অবলম্বন করা ও তার রায় মেনে নেওয়ার শামিল। এ অবস্থায় যে কেউ 'শয়তানী শক্তি' হতে পারে। এটা হয়তো তার পূজার মাধ্যমে, অথবা তার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, অথবা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। যে কোনো দল ও জাতির মধ্যে এই 'শয়তানী শক্তি' হতে পারে যাকে মানুষ তাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার ক্ষমতা দেয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা. ছাড়া। অথবা যাকে তারা পূজা করে এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে অনুসরন করে। অথবা এমনসব ব্যাপারে অনুসরন করে, যা আল্লাহর আনুগত্যকে অকার্যকর করে দেয়। একবার যখন ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান নিয়ে আসে, সে আরেকজনের সমাধান গ্রহণ করতে পারে না। সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিচার-ফায়সাল মেনে নিতে পারে না।

তৃতীয়ত : আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলিমদের কখনও তাঁর এবং রাসূল সা. যে বিধান দিয়েছেন তা ছাড়া অন্যকিছুর ওপর নিজেদের পছন্দ, অথবা সন্তুষ্টির অনুমতি দেন না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৬)

চতুর্থত: আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল জুডিশিয়াল সিদ্ধান্ত এবং বিধিবদ্ধ আইন ওহী অনুযায়ী হতে হবে। যারা তার ফয়সালা মেনে নিবে না, তাদেরকে কাফের, জালেম ও ফাসেক সাব্যস্থ করা হবে। তা ছাড়া তাদের তিনি অপরাধী এবং বিদ্রোহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৪৪)

তিনি আরও বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই জালেম। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৪৫)

তিনি আরও বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক।(সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৪৭।)

মুসলিম আইনবিদ ও কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, যেসব মুসলমান বিধানে পরিবর্তন আনে, অথবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক আইন পাস করে, ওহীর আইন ত্যাগ করে নিজের মনগড়া আইন জারি করে। তাহলে সে উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত তিনটি শ্রেণীর যেকোনো একটিতে পড়বে।

পঞ্চমত: আল্লাহ তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে তার রাসূলের ফয়সাল মেনে নেওয়ার ওপর শর্তারোপ করেছেন। যেটা মুসলমানদের মধ্যে সব ইস্যুতে উত্থিত হতে পারে। এই শর্তে যে, এই স্বীকৃতি কোনো বিরক্তিবোধ কিংবা বিদ্বেষের সাথে নয়। কিন্তু এটা হতে হবে দ-াদেশ ও সমর্পনের সংযোজন হিসেবে। আল্লাহ ঘোষণা দেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা, আয়াত : ৬৫)

ষষ্ঠত: ইসলামী শরিয়া এর সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন কিছুকে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি এটা যদি শাসকের মাধ্যমে নির্দেশিত হয় তারপরেও। তার যাই ক্ষমতা থাকুন না কেন, এটা এই কারণে যে, শাসকের বিধানিক অধিকার এই শর্তসাপেক্ষে যে, এর ফলাফল অবশ্যই ইসলামী শরিয়ার সাধারণ মূলনীতি এবং বিধানিক চেতনা অনুসারে হতে হবে। যদি শাসক সীমা অতিক্রম করে অন্যায় স্বাধীনতা নেয়, তাহলে তার রায় ওহী দ্বারা নিষিদ্ধ আইনকে অনুমোদনযোগ্য আইনে রুপান্তরিত করে না। অথবা এটা এই আইনকে গ্রহণ করতে মুসলিমকে বৈধতা দেয় না। অন্যদিকে, এটা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যকীয় যে, সে এমন আইন অমান্য করবে যা নিষিদ্ধ কাজ করতে অনুমোদন দেয়। সে তা সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, যে কোনো মানব শাসকের আনুগত্য ও বশ্যতা মেনে নেওয়া অকাট্য নয়। আনুগত্য পাওনা একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের দেওয়া সীমার ভেতর। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলে নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। (সূরা শুরা আয়াত: ১০)

শাসকের আনুগত্যের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে হাদিসে সাব্যস্ত আছে। রাসূল সা. বলেন:

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

"সৃষ্টির কোন আনুগত্যই পালন হবে না স্রষ্টার (আল্লাহ) অবাধ্যতার মাধ্যমে"।

এবং

إنما الطاعة فى المعروف

"শুধুমাত্র ভাল কাজেই আনুগত্য করা যাবে"

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة

"তাদের কেউ তোমাদেরকে গোনাহর আদেশ করলে তাতে তাদেরকে মানা এবং শুনার কোন অনুমতি নেই"।

রাসূলের সাহাবা, আলেম-উলামা এবং মুসলিম আইনবিদদের এই মতের উপর সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত্য আছে, যে শাসকের বশ্যতার কোনও দাবি উঠবে না, যতক্ষন না তাঁর নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্য তুলে ধরতে ইস্যু করা না হয়। তাই শাসক যদি আল্লহর অবাধ্যতা করে, তাহলে সে আনুগত্যের স্বত্তবান হওয়ার কোনো অধিকার রাখে না। যদি সে অবিসংবাদিতরুপে যা নিষিদ্ধ বলে মানা হয় তার অনুমোদন দেয়। যেমন- ব্যাভিচার, মদপান, ইসলাম প্রদত্ত দন্ড- পরিত্যাগ, ইসলামী শরিয়ার দেওয়া প্রাণদন্ড- রোধ এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তার অনুমোদন দেওয়া। এ ধরণের শাসককে একজন অবিশ্বাসী ও নিন্দিত ধর্মত্যাগী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। তদনুসারে, মুসলমানদের ওপর এসব ধর্মত্যাগী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। তার

বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন মাত্রার দ্রোহ হল কমপক্ষে তার সেইসব নির্দেশ অমান্য করা, যা ইসলামী শরিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সপ্তমত: ইসলামী শরিয়ার বিধান নিষ্কলুষ এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই মুসলিমদের জন্য এটা নিষিদ্ধ যে শরিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করবে, এবং কিছু বাদ দিবে। এর ওপর দলিল সরবরাহ করে উপরে আমরা তা প্রমাণ করেছি।

এসব হল ইসলামী শরিয়ার কিছু বিষয় যা দেখানো হল এবং কুরআন ও হাদিস থেকে কিছু উদৃতি দেওয়া হয়েছে। যা একজন বিশ্বাসী মুসলিমের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছে। এটা হল একটা উদাহরণ, যা প্রত্যেক মুসলমানের পালন করা এবং তার ওপর আমল করা উচিত। সাধারণ আইন যা প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস ও ধর্মকে রক্ষা করতে প্রণয়ন করা হয়েছিল তা আসলে ধর্মকে ভাইয়োলেইট করেছে, যখন সেসব ধারা সংযোজন করা হল, যা ইসলামী শরিয়ার মূলনীতির সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যা মানুষকে ধর্মচ্ছুত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিমদের নিজেদের শরিয়া জ্ঞান

মুসলিমরা নিজেদের শরিয়ার ব্যাপারে যে জ্ঞান রাখে, তা তাদের পরিস্থিতি ও শিক্ষার অনুপাতে ভিন্ন হয়। এ বিষয়ে তাদের তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে-প্রথম দল হলো, অশিক্ষিত। দ্বিতীয় দল হল, যারা ইউরোপীয়ান শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তৃতীয় দল হল, যারা ইসলামী শিক্ষাগ্রহণ করেছে। আমরা প্রতিটি দল নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করব।

অশিক্ষিত দল

এ দলের লোকেরা নিরক্ষর। অথবা সেসকল মানুষ যাদের সামান্য পড়াশোনা আছে, যখন তাদের সামনে কোনো কিছু উপস্থাপন করা হয়, তখন তাদের তা স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে সমস্যা হয় বা তারা বুঝতে পারে না। তারা সে বিষয়ে সঠিক মতামত দিতে অসমর্থ থাকে। এ দলের লোকেদের ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারে তেমন জ্ঞান নেই, একমাত্র সমষ্টিগত কিছু ইবাদতের ব্যাপারে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা ছাড়া। যা তারা পেয়েছে তাদের পিতা, পরিচিত ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক নেতাদের অনুসরণের মাধ্যমে। এরকম খুঁজে পাওয়া খুবই দুস্কর যে, এই দলের মধ্যে কেউ তার নিজস্ব ইলমের ওপর আস্থা রেখে ও ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ইবাদত করছে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, এই দলে অধিকাংশ মুসলিমদের শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। সম্ভবত দুনিয়ার ৮০ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যাই এই দলের মধ্যে পড়বে। এসব মানুষ ব্যাপকভাবে শিক্ষিতজনদের দেওয়া গতিপথে প্রভাবিত। সেই শিক্ষিতরা ইসলামী আইনের পড়–য়া হোক, বা পাশ্চাত্যের আইনের পড়–য়া হোক। লোক এদের অনুসরণ করবে। যাইহোক, লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলাম শিক্ষিত লোকদের কথা শুনতে বেশি ইচ্ছুক। যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ে তাদের জ্ঞান অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হওয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু মানুষ যখন, একটি নির্দিষ্ট বিষয় ও ইসলামের মধ্যে যোগসাজস করতে পারে না, তখন তারা ইউরোপীয় শিক্ষিতদের অনুসরণ করে।

মুসললিম আইনবিদদের জন্য এটা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, তারা এই দলের লোকদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ঠিকপথে পরিচালন করবেন। এই সাধারণদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি করতে হবে যে, জাগতিক সকল আশয়-বিষয়েও ইসলাম জড়িত। তাদের বিশ্বাস কখনও পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না তারা সকল কাজে ইসলামকে গ্রহণ না করে এবং ইসলামী শরিয়া মত না চলে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, বেশিরভাগ মুসলিম দেশের শিক্ষিত মুসলমানরা বিশাল এই জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে উদাসীন। তারা তাদেরকে মূর্খতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। আর লোকেরা ভাবে তারা সঠিক পথ অনুসরণ করছে। কিন্তু সত্য হল, তারা বিপথে ও পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। আসলে সাধারণ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে, ইসলামী শিক্ষার দায়িত্বশীলদের নীরবতার কারণে। তাদের অবহেলা প্রকারান্তরে এই মিশন সফলে সমর্থন যোগাচ্ছে।

পশ্চাত্য শিক্ষিতের দল

মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ শিক্ষিত জনগুষ্টি এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশিরভাগ মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এই দলের মধ্যে আছে, বিচারক ও আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদ।

এই দলের মানুষ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানে না। তাদের গড়পড়তা অবস্থা অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের মতো, যারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে নিজেদের পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল থেকে জেনেছে। তাদের অধিকাংশ ইসলাম ও ইসলামী শরিয়ার চেয়ে গ্রীক ও রোমান পৌরণিক কাহিনী ও আচার সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল।

এই দলের খুব কম উচ্চশিক্ষিত লোকের ইসলামী শরিয়া বা অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে স্বতন্ত্র পড়াশোনা আছে। এমনকি যারা পড়েছে, তাদের সংখ্যা খুব কম। তবে তাদের এই অধ্যয়ন খুবই সীমিত এবং ভাসাভাসা। এজন্য এই দলের মানুষদের থেকে কদাচিৎ এক দুইজনকে হঠাৎ মেলে যারা ইসলামের আসল চেতনা বুঝতে পেরেছে। অথবা যাদের ইসলামী শরিয়ার মৌলিক নীতির ব্যাপারে ভালো উপলব্দি আছে।
ইউরোপীয় শিক্ষিতরা, যাদের ইসলাম ও শরিয়ার জ্ঞান অতি সামান্য। প্রত্যেক দেশেই তারা ইসলামের ওপর কতৃত্ব করতে এবং ভাগ্য নির্দেশ করতে প্রয়াস চালায়। এইসব লোকই বাহ্যত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে মুসলিম দেশ ও ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে ।

সত্যিকারার্থে, আমাদের স্বীকার করতে হবে, এইসব লোকদের বেশিরভাগ যদিও ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারে মূর্খ। তবুও তারা ধর্মের প্রতি কিছুটা হলেও অনুরক্ত। অন্তরে তারা গভীর বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের সর্বোচ্চ জানা অনুযায়ী ইবাদত করে। তবে এও সত্য, তারা তাদের ইসলামী জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও করে না। কোনো বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধানের বইয়ের তারা সহায়তাও নেয় না। সম্ভবত এটা এজন্য যে, তাদের জন্য এসব বইয়ের গবেষণা করা কঠিন। তাদের তো ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে দীর্ঘ কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এসব বই হাজার বছর পূর্বে সে সময়কার লেখকেরা তাদের রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী লিখে গেছেন। এসব কিতাবে রেফারেন্স উল্লেখের জন্য কোনো সূচিপত্র নেই। এটা বিরক্তিকর বটে, যখন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় পুনঃপাঠ করতে হয়। অথবা কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পাঠককে অবশ্যই বিষয়টি আগাগোড়া পড়তে হয়। যতক্ষণ খুঁজে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায় পাঠ করতে হয়। ইতিমধ্যে, পাঠক হয়তো আশা ছেড়ে দিবে, তার কাংক্ষিত উত্তরটি খুঁজে পাওয়ার। যদি না সে অপ্রত্যাশিত স্থানে তা পেয়ে যায়। পাঠক হয়তো এসব বিধানিক বই শেলফে তুলে রাখবে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বিষয় উপলব্দি করতে অপরাগ হবে। ফলে বিষয়টির মৌলিক নীতি ও প্রয়োগিক আইনী পরিভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা থেকেই যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেককেই জানি, যারা ইসলামী শরিয়া পাঠ করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন; কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তারা মূলপাঠ ও উক্তি, মার্জিন ও ব্যাখ্যার মধ্যে খেই হারিয়েছেন। তারা যদি আধুনিক ধাঁচে লিখিত বই পেত, তাহলে নিজেদের এবং অন্যদের তাদের পড়াশোনা থেকে উপকৃত করতে পারতো।

মাঝে মাঝে এই ইউরোপীয় শিক্ষিতের দল ইসলামী শরিয়া নিয়ে অবাস্তব কিছু ধৃষ্টতা দেখিয়ে বেশ আমোদিত হয়। মাঝেমধ্যে তারা খুব হাস্যকর হয়ে যায়, যখন তারা বলে, সরকার এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। অথবা কেউ বলে, ইসলাম একটি ধর্ম এবং রাষ্ট্রও বটে। কিন্তু ইসলামী শরিয়া বর্তমান সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়। কেননা, এর বিশেষ কিছু অনুশাসন ক্ষণস্থায়ী হিসেবে এসেছিল। এজন্য তা বর্তমান বিষয়ের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না। এদের মধ্যে আরেক দল আছে, যারা স্বীকার করে যে, ইসলামী শরিয়া প্রকৃতপক্ষে আমাদের সময়ের জন্য মানানসাই। কেননা, এর অনুশাসন চিরস্থায়ী। তারপরও আমাদের কিছু জুডিশিয়াল

সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা ঠিক হবে না, যদি তা বিদেশী বন্ধুদের শত্রু করে ফেলে। কিছু ধাপ্পাবাজ অভিযোগ করে, ইসলামী আইন কুরআন ও হাদিসের চেয়ে ইসলামী আইনবিদদের মতামত থেকে বেশি এসেছে। এ ধরনের অভিযোগ সস্তা ও অমূলক। যারা ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারে মূর্খ তারাই এসব বলে। তাদের এসব কথা তাদের মূর্খতাকেই স্পষ্ট করে দেয়। এসব কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা নিছক প্রমাণহীন অভিযোগ।
তাদের এসব গাধামো যুক্তি ও অভিযোগ বেরিয়ে আসার কারণ দুটি। প্রথমত, ইসলামী শরিয়া বিষয়ে তাদের; মূর্খতা। দ্বিতীয়ত, তাদের উপর ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব। ইসলামী শরিয়াহর ওপর মানব তৈরি আইনের প্রয়োগের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আত্মগরিমা। তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণা ও খোঁড়া যুক্তি তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে বড় ধরনের অসংগতি ছাড়া কিছুই উপলব্দি করায় না। কেননা, এক বলয় থেকে যা স্পষ্ট হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, অন্য বলয় হতে তাতে সন্দিহান বৈধতার কথা বলা হয়। আমরা এখন হতে এসব অভিযোগ খন্ডণ করার চেষ্টা করবো এবং প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা সমালোচনা করবো।

প্রথম আপত্তি: ইসলাম ও রাজনীতি

যারা ইউরোপিয়ান শিক্ষা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, ইসলাম হল নিছক একটি ধর্ম। সরকার ও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এবার আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কুরআন এবং হাদিসের কোথায় আপনি এমন কথা পেলেন? তারা এমন প্রশ্নে হতবাক হয়। কোনো উত্তর দিতে পারে না। কারণ, এসব যুক্তির প্রমাণ তারা শুধুমাত্র ইউরোপীয়ান ইতিহাস থেকে দিতে পারবে। যেহেতু তারা ওই শিক্ষায় শিক্ষিত। কারণ, তারা সেখান থেকে শিখেছে, গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্যই দুরত্ব থাকতে হবে। একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে হবে। তারা ইউরোপীয় শিক্ষা থেকে এমনভাবে প্রভাবিত যে, তারা বিশ্বাস করে, যে কোনো দেশের যে কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে একমাত্র ইউরোপীয়ান আদর্শ গ্রহণযোগ্য সমাধান। অফসোস, তারা যদি তাদের বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতো, তাহলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো, ইউরোপীয়ান শিক্ষাপদ্ধতিসহ মানুষের তৈরি যত আইন আছে, তা কখনো প্রাধান্য পেতে পারে না। একমাত্র ইসলামিক মতবাদকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যদি ইসলামের এই মতবাদ ধর্ম ও বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে বৈষম্য করে, তখনই এসব লোকের অভিযোগ সমর্থন করা যায়। এখন যদি এই মতবাদ ধর্ম ও সংসারের যোগাযোগ ঘটায়। ইসলামের সাথে সামরিক ডিফেন্সের সংযোগ ঘটায় এবং মসজিদগুলোকে সরকারি দপ্তর গণ্য করে, তাহলে তাদের অভিযোগ মিথ্যা ও বাজে প্রতারণা হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

কয়েক বছর পূর্বে কয়েকজন যুবকের সাথে আমার দেখা। যারা তাদের আইনী পড়াশোনা মিশর থেকে শেষ করেছে। আমরা ইসলাম এবং শরিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। অতঃপর আমি আবিষ্কার করলাম, তারা মনে করে সরকার ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইসলামের কিছুই করার নেই। আমি

তাদরে নিন্দা করি। তারা আইনের মানুষ হয়েও কোনো প্রমাণ ছাড়াই ইসলামী শরিয়া নিয়ে এমন মনোভাব পোষন করে। যুক্তিতর্কে তাদের একজন বলে, 'আপনি কেন আমাদের কুরআন থেকে কোনো বিধান এনে দেখান না, ইসলাম রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয় একসাথে ধরণ করে।' আমি বুঝতে পারলাম, সে কোথায় নিশানা করেছে। আমি বলি, 'সুন্নাহ থেকে কোনো বিধান এনে দিলে তুমি খুশি আছো?' সে উত্তরে না বলে। 'কেননা ইসলামের সংবিধান হল কুরআন।' আমি তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাদের মতামতও সমান। অবাক হই এই ভেবে, এই ছেলেরা কুরআনের ওপর গভীর বিশ্বাস রাখে, অথচ তার বিষয়বস্তুর ওপর তারা নির্লজ্জ মূর্খ। তাদের জন্য আমার দু:খ হল। মূলত কুরআনের ব্যাপারে তাদের এই অজ্ঞতা, স্পষ্ট দুটি নীতিকে অস্বীকার করার পর্যায়ে তাদের নিয়ে গেছে। প্রথমত, ইসলাম জীবনের একটি সমান দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আচরণ করে। দ্বিতীয়ত হল, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলার জন্য কুরআনের মতো আরোপিত।

এই মুসলিম তরুনেরা সচেতন ছিল না যে, কুরআনে খুনী, বিদ্রোহী, চুর এবং কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে কী শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে। বিধান হিসাবে শর্ত দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

'হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৮)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

'কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পন করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে।' (সূরা নিসা, আয়াত ৯২)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক

থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৩)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও। (সূরা মায়েদা,আয়াত ৩৮)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর, আয়াত ২)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।'(সূরা নূর, আয়াত ৪)

তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের অপরাধকে নিষিদ্ধ করে এবং তার সাজা নির্দিষ্ট করে আরও কুরআনের অনেক আয়াত আছে। নির্দিষ্ট করে যেমন ধর্মত্যাগীর ব্যাপারে অথবা অনির্নিতভাবে যেমন প্রতারণা ও কুৎসার বিরুদ্ধে।

এভাবে কুরআনে নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধকে নিষিদ্ধ করে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে তা দন্ডনীয় করা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম কাজ হল অপরাধ ও তার সাজার বিধান দেওয়া। কিন্তু এটাকে অনেকেই পবিত্র ধর্মীয় বিষয় হিসেবে মানতে চান না।

ইসলাম যদি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিষয় একত্রিত না করত, তাহলে এসব আয়াত কুরআনে থাকতো না। কুরআন যদি মুসলমানদের ওপর এসব বিধান গ্রহণ করা এবং কার্যকর করাকে অবশ্যপালনীয় করে থাকে, তাহলে কুরআন এটাও বলে যে, এসব আয়াত কার্যকর ও প্রয়োগ করতে এমন সরকার ও রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, যারা এটা কার্যকর করবে। যা এসব কাজকে তার অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করবে।

তাছাড়া, কুরআনের দাবি যে, সরকারের বিষয় আশয় অবশ্যই পরামর্শের আওতাধীন। আল্লাহ সেসব লোকদের বিশ্বাসী হিসেবে বর্ণনা করেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

‘যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে। (সুরা আশ শূরা, আয়াত ৩৮)

এবং আল্লাহর নির্দেশ শাসককে মানুষের কথা শুনতে হবে। তিনি বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

‘এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।’(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯)

ইসলাম যদি রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করত, তাহলে সে সরকারের সৃষ্ট সংকট ও কর্তব্যের ব্যাপারে এত বিশদ কথা বলত না। কুরআনের দাবি হল, শাসনের মানদন্ড হবে ন্যায়বিচার ও স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রাপকদেরকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৫৮)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি হল, মানুষের সম্পর্কেরমধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম সরকার ও ধর্ম দুটির সমন্বয় ঘটায়। ইসলাম হুকুম দেয়, রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলাম যা প্রকাশ করেছে তদনুসারে শাসন করবে। তাছাড়া কুরআন বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেয়, তারা অন্যদের সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

‘তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪)

‘সৎকর্ম’ মানে কী? এটা সেসব কিছু যা ইসলামী শরিয়া দাবি করে। আর ‘অসৎকর্ম’ যা ইসলামী শরিয়া নিষিদ্ধ করে। এটা যদি বাধ্যবাধকতা হয় যে, মুসলিমদের মধ্যে একটি দলকে একান্তভাবে নিয়োগ করা হবে, যারা ইসলামী আইন বলবত করতে পরামর্শ দিবে। এটা করতে হলে রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলামী হতে হবে। নতুবা এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কার্যকর করা যাবে না। এখানে আবারও কুরআন ধর্মীয় ও সাংসারিক বিষয়কে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে।

আমরা ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়কে একত্রিতকারী কুরআনের একক আয়াত পাই। এ ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত আয়াতও আছে। যেমন সূরা আনআমের ১৫১ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

‘বল, ‘আস, তোমাদের প্রতিপ্রালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। তা এই: ‘তোমরা তার কোন শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।’ (সূরা আনআম, আয়াত ১৫১)

এই একক আয়াত নিষিদ্ধ করেছে, বহুশ্বেরবাদ, পিতামাতার অবাধ্যতা, মানুষহত্য, প্রকাশ্য কিংবা গোপনে অশ্লীলতা এবং স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ জীবনযাপন। সন্দেহাতীতভাবে এসব জাগতিক ও নৈতিক বিষয়ের মিশ্রণ।

রাষ্ট্রের ওপর কুরআনের দাবি, তা ঐশীবাণীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। যা ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বুনিয়াদের ওপর একত্রিত রাখেবে। আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

‘আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম নিষেধ করবে। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪১)

এই উদ্ধৃতি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আদর্শ রাষ্ট্র হল সেটা, যা তার নাগরিককে ইবাদত করতে, দান করতে নির্দেশ দেয়। এর সাথে আল্লাহ যা প্রতিষ্ঠার হুকুম করেছেন এবং যা করতে বারণ করেছেন, তা মেনে চলে। এই বিধান প্রয়োগ করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প

নেই। ইসলামের ভিত্তির ওপর রাজনৈতিক বিষয় ও সরকারী বিধান একসাথে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কুরআনে অসংখ্য বিধান আছে, যা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা যাবে না। যাতে আলোচনা রয়েছে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিক দ্বন্ধ, শান্তি ও যুদ্ধ, চুক্তি ও পরিষদ, ব্যবসা, ব্যক্তিগত বেসামরিক অবস্থা এবং আরও অনেক বিষয়। যেমন-গরিবদের ফায়দার জন্য কুরআন ধনীদের ওপর একটি অধিকার শুল্ক বা ট্যাক্স ধার্য করে। অনাথদের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। নিঃস্ব ও মুসাফিররা সরকারী কোষাগার থেকে সাহায্য পায়। এই বিধান দেয় ঐশী আইন, যা সকল বিষয়ের জন্য। যা আমাদের সামাজিক জীবনের সাথে সাথে বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত। এটা পার্থিব বিষয়ের সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে এবং শাসক ও শাসিতদেরকে পথ নির্দেশ করতে দুটি বিষয়কেই ব্যবহার করে। জাগতিক বিষয়াবলী এবং ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক কুরআনে এতটাই স্পষ্ট যে, এটা নির্বিঘ্নে বলা যায়, ইসলামে ধর্ম হল রাষ্ট্রের একটি প্রকাশ এবং রাষ্ট্র হল ধর্মেরই একটি প্রকাশ।

যাইহোক, সেসব মুসলিম যুবক, যারা কুরআনের ওপর বিশ্বাস রাখে। তারা সচেতন নয় এব্যাপারে যে, কুরআনের নির্দেশ হল রাসূলের সুন্নাহ অর্থ্যাৎ তার কথা ও কাজ হল আইন, যা সকল মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। কুরআন নির্দেশ দেয়, এসব কথা ও কাজের সম্মতি মান্য করতে। এমনকি যদি এই অবস্থান নিশ্চিত করে কোন আয়াত নাও থাকত, তবুও মুসলিমদের গোটা জীবনের জন্য সুন্নাহকে পবিত্র আইন হিসেবে প্রয়োগ করতে হতো। সে সশ্রদ্ধ বিবেচনা থেকে যে,রাসূল কখনও তার নিজের প্রবৃত্তি ও মানবিক আত্মগর্ব থেকে কথা বলেন না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ♦ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

‘এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।(সূরা আননাজম আয়াত ৩-৪)

কুরআনে অনেক আয়াত আছে, যা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য এবং তার ফয়সালাকে অবশ্যপালনীয় করেছে। আল্লাহ বলেন:

ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

‘হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের, এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

‘কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৮০)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

‘বল, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।’ (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩১)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।(সূরা হাশর, আয়াত ৭)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু’মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা, আয়াত ৬৫)

দ্বিতীয় আপত্তি : আধুনিকতার সাথে শরিয়া বেমানান

কিছু ইউরোপীয় শিক্ষিতজন প্রায়শই বক্তব্য দেন যে, আমাদের চলতি যুগের সাথে শরিয়া মানানসই নয়। কিন্তু তারা তাদের এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ বা কারণ হাজির করেন না। তারা কী বলতে চায়, বিশেষ কিছু নীতি বা নীতিসমূহ আমাদের এই যুগে প্রয়োগযোগ্য নয়। তাদের এসব দাবি যদি কোনো মূল্য রাখত, তাহলে তাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেত বা তাদের দাবির ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তারা তো যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই তুড়ি মেরে উড়িয়ে বলে, পুরো ইসলামী শরিয়াই বর্তমান সময়ে অচল। এটা কোনো বক্তব্য হলো!! তাদের বক্তব্য তো বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদের নিজেদের মতোই অচল। ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারে তাদের এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ শিক্ষিতজনের মধ্যে সবচেয়ে অল্পশিক্ষিত ব্যাক্তিটিরও এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তাদের এই মত সম্পূর্ণ মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শরিয়ার উপযোগিতা নির্ণীত হওয়া উচিত এর নীতির স্বকীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে। ইসলামী শরিয়ার একটি নীতিও এমন নেই, যাকে অগ্রহণযোগ্য ও অনুপোযুক্ত হিসেবে প্রতিপন্ন করা হবে। এমনকি

এর ক্ষুদ্র একটি নীতির ব্যাপারেও এই প্রমাণ দেওয়া যাবে না। শরিয়ার কিছু স্পষ্ট নীতি আছে, যার ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় মুসলিমরা নিজেদের মূর্খতার কারণে বিচ্যুতির অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছে।

ইসলামী শরিয়া সব মানুষের অধিকার শর্তহীন সমান করেছে।
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৩)

রাসূল (সা.) বলেছেন:

الناس سواسية كاسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى

"সকল মানুষ সমান চিরুনীর দানার মতো। কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের প্রাধান্য নেই শুধুমাত্র ধার্মিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা ব্যতীত"।

ইসলামের সমতার এই বিধান তের শত বছর পূর্বে মানুষের মধ্যে এসেছিল। অপরদিকে মানুষের তৈরি আইন, যা নিয়ে আমাদের নাদান বন্ধুরা গর্ব করে-তা এমন সমতাকে স্বীকার করেনা। যে আইন এসেছে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। এমনকি আজও বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা এই নীতি প্রয়োগের ওপর বলহীন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়।

তাছাড়া স্বাধীনতার অসামান্য নীতি ইসলামী শরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠিত। এর আওতায়, চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভালোভাবে স্বীকৃত। এমনকি কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। যেমন-কুরআনে বলা হয়েছে:

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

‘বল, ‘আকাশম-লী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ্য কর।’ (সূরা ইউনুস, আয়াত-১০১)

ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

‘যাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৬৯)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين
‘দীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নাই।’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।’ (সূরা আলে‘ইমরান, আয়াত-১০৪)

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে মানব তৈরি আইনে স্বাধীনতার নীতি তার তিনটি বিভাগসহ স্বীকৃত ছিলো না। যদিও মূর্খরা ইসলামী শরিয়া যে এসব নজির স্থাপন করেছে তা অস্বীকার করে। তারা এসব আইনকে ইউরোপীয় আইনের বৈশিষ্ট বলে চালিয়ে দেয়।

‘অকাট্য ন্যায়বিচার ’ ইসলামী শরিয়ার অন্যতম একটি মৌলিক নীতি। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। (সূরা নিসা, আয়াত-৫৮)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৮)

এই নীতিও ইসলামী শরিয়ায় তার শুরুর সময় থেকে ছিল যা আটার শতকের শেষ দশক পর্যন্তও মানব তৈরি আইনে স্বীকৃত ছিল না।

এই হল, তিনটি প্রধান নীতি যার উপর মানব তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের শরিয়া এগার শতকেরও বেশি সময় পূর্বে যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাহলে তারা কিভাবে বলে, মানব তৈরি আইন আমাদের আধুনিক যুগের জন্য উপযুক্ত আর ইসলামী শরিয়া সমান কাঠামো ও নীতির প্রবক্তা হয়েও উপযুক্ত নয়।

অন্যদিকে অহি নাজিলের প্রারম্ভ থেকেই ইসলাম পারস্পরিক পরামর্শ নীতি প্রয়োগের বিষয়টি নির্দিস্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم

‘নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।’ (সূরা শুরা, আয়াত-৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر

‘এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।’ (সূরা আলে ‘ইমরান, আয়াত-১৫৯)

অতএব ইসলামী শরিয়া এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মানব তৈরি আইনের চেয়ে প্রায় এগারো শতক অগ্রবর্তী। শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের ব্যাপার ছাড়া। ইংল্যান্ডে তা ইসলামের দশ শতক পর স্বীকৃতি পায়। তাই ইউরোপীয় আইন এমন কোনো নতুনত্ব প্রবর্তন করেনি, (যা হল পারস্পরিক পরামর্শের একটি প্রয়োগিক নীতি) যখন তারা সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব করে। তারা কেবল তাদের আবেগ পেয়েছে, যেখানে ইসলামী শরিয়া উপসংহার টেনেছে।

এছাড়া ইসলাম তার প্রাথমিক রেভ্যুলেশন থেকেই রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেছে। তার বৈশিষ্ট বলে, তার দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ভুল পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ হবে। সুতরাং এই বৈশিষ্টানুযায়ী আইনের চোখে শাসক ও জনগণ দুজনই সমান। কারণ শাসক তার কর্মে নিয়ন্ত্রিত ওই বিধানের দ্বারা এবং জনগণের উপর তাদের অন্যায় কোনো সুবিধা নেই। সাম্যের বিধান অনুযায়ী এক কাতারে দুজনেরই অবস্থান।

ইসলামী শরিয়া এইসব বিধানের প্রবর্তন করে ইউরোপীয় আইনের এগারো শতক পূর্বে। এই শরিয়া বর্তমান যুগের সাথে বেমানান, এটা কিভাবে অভিযুক্ত হতে পারে?

তাছাড়া ইসলামী শরিয়া মদ খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদন করেছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু’মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য ব¯‘, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৯০)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان

‘তালাক দুইবার। অত:পর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।’(সূরা বাকারা, আয়াত-২২৯)

মানব তৈরি আইন বর্তমান ক্রমোন্নতির সময় ছাড়া কখনও বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি এবং মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধের মধ্যে যে লাভ তার স্বীকৃতি দেয়নি। এখন নতুন আইনে কিছু কিছু মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। আর অন্যগুলোর উপর আংশিক বিধিনিষেধ আরোপ করে। মজার ব্যাপার হলো, শরিয়া থেকে সংগৃহীত এসব আইন উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর স্বয়ং শরিয়াকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

ইসলামী শরিয়া হল আইনের সর্বপ্রথম পদ্ধতি যা বাস্তবেই সামাজিক সহযোগিতার ধারণা এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

‘সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগীতা করবে না।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-২)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ♦ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

‘আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে।‘যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের।’ (সূরা মা’আরিজ, আয়াত-২৪,২৫)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

‘তাদের সম্পদ থেকে ‘সাদাকা’ গ্রহণ করবে। এরপর তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত তো কেবল নিস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা,আয়াত-৬০।)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

‘আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।’ (সূরা হাশর, আয়াত-৭)

উপরে উল্লিখিত দুটি ধারণা আমাদের শরিয়া দ্বারা তের শত বছর পূর্ব থেকে পরিচিত। যখন অমুসলিম বিশ্ব বর্তমান শতকের পূর্বে এ ব্যাপারে সামান্য সচেতন ছিল। আর এখন তারা তন্মধ্যে আংশিক কিছু প্রয়োগ করছে।

ইসলামী শরিয়া একনায়কতন্ত্রের চর্চা, রাষ্ট্রীয় শোষণ, ঘুষ এবং দূর্নিতীকে নিষিদ্ধ করে। রাসূল (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই কুক্ষিগতকারী একজন অপরাধী।’

আর আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের হাতে তুলে দিও না। ’ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৮)

এসব মহৎ ধারণা মানব তৈরি আইনে স্বীকৃত ছিল না। দীর্ঘকাল পরে তা সংযোজিত হয়েছে।

ইসলামী শরিয়া জোড়ালোভাবে নিষিদ্ধ করে গুরুতর পাপের দালালি, নির্লজ্জতা এবং অনৈতিকতাকে। তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক। নিষিদ্ধ করে পাপ ও নিগ্রহতাকে। আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

‘বল, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা।’ (সূরা আ‘রাফ, আয়াত-৩৩)

একই সময়ে শরিয়া ভালো কাজে প্রেরণাদানকে অনুমোদন করে এবং যা সঠিক তা বাস্তবায়ন করতে বলে ও যা মন্দ তা নিষিদ্ধ করে।

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম। (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত-১০৪)

এরমত আরও অনেক নীতি ইসলামী শরিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে বাস্তবরুপে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এমন সঠিক নমুনা যা মানুষজাতি খুঁজছে এবং তা অর্জন করার স্বপ্ন দেখে।

শরিয়ার একটি ধারা যার নীতি যথার্থ আদর্শ উপস্থাপন করে এবং যা সমকালীন মানবজাতি আন্তরিকভাবে খুঁজে ফিরছে তা কিভাবে আমাদের যুগের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হবে?

আমরা যদি মানবিক, সামাজিক এবং আইনী রীতিনীতির দিকে তাকাই, যা আমাদের যুগকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং যার জন্য মানুষ খুব গর্বিত। তাহলে আমরা দেখতে পাই, এসব প্রত্যেক নীতি ইসলামী শরিয়ায় সর্বোচ্ছ সম্ভবপর পন্থায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামী শরিয়া বর্তমান সময়ের জন্য অনুপযুক্ত এই অভিযোগ করা চরম এক ধৃষ্টতা। এই অভিযোগ আসে চরম মূর্খতা ও অন্ধতার কারণে। এর স্বপক্ষে প্রকৃতপক্ষে কোনো দলিল নেই। এ ধরণের অভিযোগের একমাত্র কারণ হতে পারে যে, তাদের শিখানো হয়েছে যে, পুরনো আইন ও বিধান অধুনালুপ্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত-যা আমাদের আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এই অস্পষ্ট বর্ণনাকে সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তা ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারেও প্রযোজ্য মনে করছে। তারা শরিয়াকে বিবেচনা করছে একটি 'পুরনো' আইন এবং 'পুরনো' বিধান হিসেবে। তারা কখনও ইসলামী শরিয়া ও মানব তৈরি আইনের মধ্যকার বাস্তবিক ব্যবধানের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি।

তৃতীয় আপত্তি: শরিয়ার কিছু বিধান আংশিকভাবে অস্থায়ী

কিছু মানুষ আছে, যারা ইউরোপীয় শিক্ষিত। তাদের ধারণা হল, বর্তমান যুগের প্রয়োজন পুরণে ইসলামী শরিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু এর কিছু বিধান মূলত সাময়িকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এ কথার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু বিধানের কথা বুঝায়। বিশেষকরে যেসব দন্ডের সাথে মানব তৈরি আইনের কোনো সামঞ্জস্য নেই। যেমন-পাথর নিক্ষেপে হত্যা ও অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না যে, এ ধরণের ইসলামী আইন সেকেলে। সর্বোপরি তারা যা উপস্থাপন করে, তা সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। এর একমাত্র কারণ হল, তারা তাদের আইনের মধ্যে সমান কোনো আইন পায় না। তাই তারা চেষ্টা করে এসব অমূলক অভিযোগ দ্বারা ইসলামী আইনের কর্তৃত্বকে খর্ব এবং ব্যর্থ করতে। এখন যদি

মানব তৈরি আইন তুলনামূলক দন্ড অন্তর্ভূক্ত করত, তাহলে এইসব লোক তাদের চিন্তার পরিবর্তন করত এবং ঘোষণা দিত যে ইসলামী আইনের বিধান চিরস্থায়ী।

এসব মুসলিম যদি নিজেদের ধর্ম ইসলামকে যথাযথভাবে বুঝতে পারত, তাহলে তারা দেখত যে, ইসলামের বিধান হল চিরস্থায়ী। এটা কোনো অস্থায়ী বিষয় নয়। যা কিছু রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় রহিত করা হয়নি, তা কেয়ামত পর্যন্ত আর রহিত করা সম্ভব নয়। রাসূলের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কুরআন প্রকাশ করে যে এখন ইসলামের অবয়ব পূর্ণ হয়েছে। তারপরে আর এতে সংযোজন অথবা বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পুর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৩)

আমরা যদি কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী বিধানের ধারণা গ্রহণ করি, তাহলে সমানভাবে তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হবে। ইসলামী শরিয়ার গোটা অবয়ব ধ্বংশ হয়ে যাবে। এর যে কোনো বিষয় বাস্তবায়নে ব্যক্তির অদ্ভুত সিদ্ধান্তের উপর চলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চতুর্থ আপত্তি : শরিয়ার কিছু বিধান বাস্তবায়নের অনুপযোগী

যারা তর্ক করেন যে, কিছু ইসলামী বিধান প্রয়োগ করা উচিত হবে না, তাদের এই বক্তব্য স্বয়ং তাদের ওই বিশ্বাসের বিপরিত হয় যে, শরিয়ার সকল নীতি স্বভাবগতভাবে এবং প্রয়োগিকভাবে চিরস্থায়ী হবে। যাইহোক, তাদের অভিমত হল-নির্দিষ্ট কিছু দন্ডবিধি, যেমন- পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং হাত কাটা আমাদের সময় বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দূর্বল। আর এসব মুসলিম দেশে যেখানে কিছু বিদেশী লোক বসবাস করে এবং যারা এসব দন্ডের অধীনে আসতে অস্বীকার করে। এছাড়া তাদের সরকার আপত্তি জানাবে, তাদের নাগরিকদের উপর এসব আইন প্রয়োগ না করতে। কার্যত এরা বিদেশী শক্তির ধিক্কারের ভয়ে ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে অনাগ্রহী। কিন্তু এ ধরণের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে অসংগত। আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৪৪)

এখানে কিছু মুসলিম আইনবিদদের অভিমতের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যারা ব্যভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অপরিহার্যভাবে পাথর মারা কিংবা হাত কাটার আয়ত্তাধীন নিয়ে আসেননি। এই মত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ আমরা দেখিনা। তা সত্তেও এটা অবশ্যই জোর দেওয়া উচিত যে, পাথর নিক্ষেপের দন্ড মূলত প্রতিকী। যেহেতু ইসলামের দাবি অনুযায়ী সাক্ষী দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণ করা অত্যন্ত দূরুহ ব্যাপার। রাসূল (সা.) এবং খলিফাদের শাসনামলে সকল ব্যভিচারের সাজা সাব্যস্ত হয়েছে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। কিন্তু কখনও তা সাক্ষীর মাধ্যমে হয়নি। পরিস্কার স্বেচ্ছা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান দেওয়া যায়। অথবা চারজন সচ্ছরিত্র ব্যক্তি যারা সরাসরি যৌনক্রিয়া দেখেছেন তাদের সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়। তবে সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার সাব্যস্ত করা খুবই দূরুহ। এই যুগে নিশ্চয়ই নেহাৎ বিরল ঘটনা এটা হবে যে, একজন বিশ্বাসী স্বেচ্ছায় তার ব্যভিচারের কথা স্বীকার করবে এবং জিদ করবে তার স্বীকারোক্তিতে, যাতে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

পঞ্চম আপত্তি : ইসলামী শরিয়া আইনবিদদের মতামতের উপর নির্ভরশীল

ইউরোপীয় শিক্ষিতদের মধ্যে একদল লোক আছে, যাদের বিশ্বাস, ইসলামী শরিয়া প্রাথমিকভাবে আইনবিদদের দ্বারা প্রণীত। যদি কেউ তাদের সামনে ইসলামের এমন এক থিউরি উপস্থাপন করে, যা পরবর্তীকাল পর্যন্ত জাগতিক আইনে অপরিচিত ছিল। তখন তারা মুসলিম আইনবিদদের ব্যাপারে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা সপ্তম ও অষ্টম শতকে বিচারিক দক্ষতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, যেখানে অন্যান্য আইনবিদরা উনিশ ও বিশ শতকের পূর্বে পৌঁছতে পারেননি, কিংবা পৌঁছার কল্পনাও করেননি।

এধরণের চিন্তা-ভাবনার এক লোক একবার আমাকে বলে, সে মনে করে মুসলিম আইনবিদরা সুপারম্যান ছিলেন! কারণ, তারা মানুষের কল্পনাশক্তির তেরশতক সমুখের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারতেন।

কিন্তু যারা মনে করেন, ইসলামী শরিয়া আইনবিদদের আবিস্কার, তারা নিঃসন্দেহে সেসব মানুষের মতো ভ্রান্তিতে আছেন, যারা বিশ্বাস করে, স্বয়ং আইনবিদরা মানুষের চিন্তাধারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন।

আসল কথা হল, মুসলিম আইনবিদরা (তাদের অগাধ পান্ডিত্য ও প্রগাঢ় প্রতিফলন থাকার পরও) তাদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে কোনো নতুনত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। তাদের প্রখর চিন্তাশক্তির উপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তারা সাধারণ মানুষের মানদন্ডের উর্ধ্বে ছিলেন না। বিষয় হল, তারা তাদের আয়ত্তের মধ্যে এমন এক পদ্ধতি পেয়েছিলেন, যা সর্বাঙ্গীন মূলনীতি ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ ছিলো। তারা এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণ করেছেন গভীরভাবে। এর তো বেশি কিছু তারা করেননি, যা যে কোন

আইনবিদ এবং প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি করার চেষ্টা করবে যে, সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রত্যেকটি ধারণাকে নির্ধারিত করে দেওয়া। তার সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং প্রত্যেক মূলনীতি যার সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত, তার অধীনে তা বিন্যাস করা। এখানে যদি কোন উদ্ভাবন কিংবা চিন্তার অগ্রগামীতা হয়ে থাকে, তাহলে তা ইসলামী শরিয়ারই উদ্ভাবন, যা স্বয়ং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশের অগ্রগামী ছিল। ইসলামী শরিয়া; যা এসেছে মানবতাকে পথনির্দেশ করার অভিপ্রায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ হিসেবে। এসেছে উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার উচ্চশিখরে পৌঁছে দিতে।

মুসলিম আইনজ্ঞরা সমতার অকাট্য ধারণা, অসীম স্বাধীনতা কিংবা ব্যাপক সুবিচার আবিস্কার করেননি। কিন্তু তারা তা বের করেছেন কুরআনের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ থেকে। আমরা ইতিপূর্বে এরকম কিছু আয়াত পেশ করেছি। মনে করি না, সেসবের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। মুসলিম আইনবিদরা যখন বাণিজ্যিক ব্যাপারে সাক্ষী গ্রহণ করেছেন, তখন তারা সিভিল অবলিগেশনের রিটের ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেননি। কিন্তু এসব কুরআনের আয়াতে আরোপ করে দেওয়া হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ....

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

‘হে মু’মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও;...তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না।... কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখলেও কোন দোষ নাই।’ (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮২)

মুসলিম আইনবিদরা নিজেরা সেই তত্ত্ব প্রবর্তন করেননি যে, ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যবে, যা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধার্য করা হয়েছে। অথবা ঋণগ্রহীতার অধিকারের সেই ধারণা, যাতে নির্দেশিত হয়েছে চুক্তির নিয়মাবলী; বরং তা প্রকাশিত হয়েছে কুরআনের আয়াতের দ্বারা। আল্লাহ বলেন-

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

‘সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়-বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, এবং তার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয়

অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।'(সূরা বাকার, আয়াত:২৮২)

তারা কোন সম্ভাব্য তত্ত্ব প্রণয়ন করেননি, যা আমরা 'পরিবর্তিত পরিস্থিতির তত্ত্ব' নামে জানি। তা আহরণ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত থেকে:
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না যা তার সাধ্যাতীত।' (সূরা বাকারা, আয়াত:২৮৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

(সূরা হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه

'যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন; তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন; তবে তোমরা নিরুপায় হলে, তা স্বতন্ত্র।' (সূরা আনআম, আয়াত : ১১৯)

আইনবিদরা বাধ্যবাধকতা ও বলপ্রয়োগের কারণে যে দায়িত্তহীনতা তার তত্ত আরোপ করে যাননি, কিন্তু কুরআন করেছে:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

'তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।' (সূরা নাহল, আয়াত ১০৬)

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

'...কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩)

রাসূল (সা.) বলেছন:

رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

‘আমার উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত (অনিচ্ছাকৃত) ভুলের জন্য, বিস্মৃতির জন্য এবং যা করতে তারা বাধ্য ছিল।’

আইনবিদরা তো সেসব লোক ছিলেন না, যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ এবং ঘুমন্তের দন্ডদান থেকে বাদ দেওয়ার তত্ত্বের জন্মদাতা। বরং এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাসূল (সা.) বাণীর দ্বারা :

رفع القلم عن ثلاثٍ ، عَنِ الصَّبيّ حتى يحتلمِ ، وعنِ النائم حتى يصحو ، و عنِ المجْنونِ حتى يَفيق

‘কলম (অর্থ্যাৎ রায়) তুলে নেওয়া হয়েছে তিনজনের জন্য: বাচ্ছা বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, নিদ্রিত জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ভালো হওয়া পর্যন্ত।’

‘ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি’র ধারাটিও আইনবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত নয়। এটা প্রতিষ্ঠিত কুরআন দ্বারা। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

‘কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।’ (সূরা ফাতির, আয়াত : ১৮)

রাসূল (সা.) বলেছেন:

ولا يؤاخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة أخيه " و حيث يقول لابي رمثة وولده : انه لا يجنى ولا تجنى عليه

ব্যক্তি কখনও তার পিতা অথবা ভাইয়ের অপরাধের কারণে নিন্দিত হতে পারে না।’ তিনি আবু রিমছা ও তার ছেলেকে বলেছেন, ‘তোমাকে তার অপরাধে পাকড়াও করা হবে না, কিংবা তাকে তোমার অপরাধের কারণে।’

মুসলিম আইনজ্ঞরা ‘দুর্ঘটনাজনিত’ ও ‘পূর্বপরিকল্পিত’ এই দুটি বিধানের মধ্যে নিজেরা প্রভেদ করে দেননি। কিন্তু তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

‘কোন মু’মিনকে হত্যা করা কোন মু’মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মু’মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু’মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৯২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

‘হে মু’মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে।’ (সূরা বাকারা, আয়াত :১৭৮)

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم

‘এই ব্যাপারে কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে।’ (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫)

আমরা কদাচিৎ এমন কোনো থিউরী বা সাধারণ নীতি পাই, যা কুরআন অথবা সুন্নাহর বক্তব্য ছাড়া প্রতিষ্ঠিত। আইনবিদরা এসব থিউরী ও মূলনীতির ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করেননি। এর শর্তাবলী যার আওতায় প্রযোজ্য তা স্পষ্ট করেছেন এবং এর শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তারা অপরিবর্তনীয়ভাবে ইসলামী শরিয়ার কাঠামোর মধ্যে কাজ করে গেছেন এবং নিজেদের এর পদ্ধতি ও চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাছাড়া তারা শরিয়ার উপাদানসমূহ ও সিদ্ধান্তের সাথে প্রাথমিক বা আসল নীতির দিকে সম্পর্কিত করতে বড় ধরণের প্রচেষ্টা করেছেন। তারা সেসব নীতি ব্যাখ্যা করেছেন, যা তাতে প্রযোজ্য হয়। বিশেষকরে যেহেতু শরিয়া ঐসব সিদ্ধান্ত ও উপাদানসমূহকে সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির আওতায় ব্যবস্থাপনার জন্য খুঁটিনাটি বক্তব্য প্রদান করেনি।

এটাই হল প্রকৃত সত্য ও বাস্তব সমাধান ওই দোষারোপের বিরুদ্ধে, যারা বলে ইসলামী শরিয়া হল আইনবিদদের জালিয়াতি। কোন সন্দেহ নেই, একটি গুরুতর ভুল ও একটি ভ্রমাত্মক ও অগ্রহনীয় তুলনা থেকে উৎপাদিত, যা ইসলামী বিধান ও গতানুগতিক আইনের মধ্যে করা হয়েছে। এটা শুধু পরবর্তীদের দ্বারা হয়েছে, যারা সাধারণ গতাণুগতিক আইন খুজে খুজে সংগ্রহ করেছিল। যা আরোপিত নীতি ও কার্যকর আইন হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণরুপে আইনবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল।

আমি আশা করব এসব ভদ্রলোকরা‘জাহিরিয়া’ মতবাদের ব্যাপারে কিছু পড়াশোনা করবেন। এ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আইনবিদরা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা (ঐকমত্য) সংশ্লিষ্টতা ছাড়া অন্য কোন উৎসকে স্বীকৃতি দেন না। এমনকি তারা যে কোন সাহাবীর উপমা,ব্যাখ্যা ও মতামতকে শরিয়ার উৎসের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি যদিও জাহেরিরা পরোক্ষভাবে উদ্ধৃত সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে, তবুও তারা কুরআন থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পায় এবং তাদের প্রত্যেকটি থিউরি ও প্রত্যেকটি নীতির সমর্থনে হাদীসও পায় যা তারা গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার এসব বন্ধুদের সন্তুষ্ট করতে এই ধারণা নিজেই যথেষ্ট। যাদের ইসলামী শরিয়া সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষিত

এই দলের লোকেরা হল যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পেয়েছে। তবে এরা সংখ্যায় নগন্য নয়, যদিও তারা ইউরোপীয়ান শিক্ষিতদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। তবে সাধারণ মুসলিমদের ওপর এই দলের অর্থ্যাৎ ইসলামী শিক্ষিতদের বলিষ্ঠ প্রভাব আছে। বিশেষ করে ইসলামী বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। তবে এই দলের রাজনৈতিক কোনো ক্ষমতা বা প্রভাব নেই এবং তাদের নেতারা কদাচিৎ সরকারি কার্যাবলী গ্রহণ করেন। নতুবা তারা ধর্মপ্রচার করা এবং আদালতের সাধারণ অধিবেশনে একটি জুডিশিয়াল পদ পেয়ে থাকেন।

ইউরোপীয়ান আইন প্রবর্তনের আগে ইসলামী শিক্ষিতদের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু ইউরোপীয় আইন প্রবর্তনের ফলে নতুন পরিবেশে এই দল কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত তারা শাসনকার্য থেকে ছিটকে পড়ে। দীর্ঘদিন তারা এই মূল্যহীন পদমর্যাদায় থাকতে থাকতে একসময় নতুন 'সামাজিক মর্যাদা'র ওপর অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন পরিণতির জন্য অসন্তুষ্ট নন। এর মূল কারণ হল, তাদের বিদ্রোহ করার অযোগ্যতা অথবা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের অক্ষমতার কারণে। এটা হয়েছে তাদের নীরব বশ্যতা স্বীকার এবং পরিবর্তনকে সাগ্রহে গ্রহণ করার কারণে।

ইসলামী শিক্ষিতরা নিজেদেরকে ইসলামের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিবেচনা করেন এবং মুসলমানদের দ্বারাও তা বিবেচিত হন । যেহেতু তারা এর বিধি-বিধানের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত থাকার কথা এবং নেতা হওয়ার কারণে ধর্মরক্ষায় তারা সর্বোচ্চ সক্ষম গোষ্ঠী। কারও কারও মতে, বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে এই দল ধর্মরক্ষায় একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মূল কারণ হল, ইউরোপীয় আইনের বহিরাক্রমণ যা বর্তমানে ইসলামী দেশগুলোতে প্রচলিত। এটা ঘটেছে মুসলিম জেনারেশনের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার জমাটাবস্থার কারণে। অবশেষে এমন অবস্থা এলো যে, মানুষ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যেমন রোজানা ইবাদত এবং ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছাড়া আর কিছুই জানতো না। অবস্থা এমন বেগতিক হতে থাকে যে মূর্খ লোকেরা বিশ্বাস করতো যে এরপর যে আইন বলবৎ ছিল তা ইসলামী আইন। আর শিক্ষিতরা বিশ্বাস করতো, ইসলাম নিছক একটি 'ধর্ম' মাত্র। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের উপযোগী কোনো কিছু তারমধ্যে নেই। ফলে সত্যের পথনির্দেশ করতে সেসব মুসলিম আইনবিদ ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে জানে এমন কেউ বাকি রইল না।

মুসলিম শিক্ষাবিদরা যদি ইসলাম রক্ষা করতে বারকয়েক ব্যর্থও হন, যা অপ্রীতিকর; কিন্তু তা স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক ফলাফল বলা যায়। যা কোনো কলঙ্ক বয়ে আনে না। কিন্তু যা দূর্নাম বয়ে আনে তা হচ্ছে, সম্ভাব্য সব চেষ্টা প্রয়োগে অসফলতা এবং নিজেদের ধর্মের জন্য সময় উৎসর্গ ও

সংগ্রামে ব্যর্থতা। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সকল চেষ্টাই করে গেছেন, যদিও পরিস্থিতি অনুকূল ছিলো না। সন্দেহ নেই, এখনও তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তারা কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের প্রত্যাশা তাদের অবিরাম সংগ্রাম বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হবে।

তবে মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে একটি প্রজন্ম রয়েছে, যারা খুব ভালো ইসলামী শিক্ষা পেয়েছে। যে তরুণেরা ইসলামের হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা তাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং তারা এটাকে শক্তভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। তাদের দূর্বলতা হচ্ছে, তারা তাদের পূর্বসূরীদের পথে হাঁটছেন। তাদের বেশিরভাগ সময় আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনে কিংবা বক্তব্য দিয়ে ব্যয় করছেন। তারা কি তাদের মুসলিম ভাইদের নিজেদের বাতিল হয়ে যাওয়া শরিয়া সম্পর্কে অবগত করেছেন। তারা কি সাবধান করেছেন মুসলিম ভাইদের বাহির থেকে আমদানী করা আইন সম্পর্কে, যা ইসলামের বিধান ও জুডিশিয়াল সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা করতে পারলে তাদের নিজেদেরর জন্য এবং নিজেদের ধর্মের অনেক সুফল বয়ে আনতো। তারা সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও অর্থহীন ধকল থেকে নিজেদের মুক্তি দিতে পারতেন।

নতুন প্রজন্ম ইসলাম প্রচারের যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে, তাতে হয়তো অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য কার্যকর হবে। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হয়েছে, তাদের বুঝাতে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। যারা জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং মুসলিম দেশগুলোর সরকারে প্রতিনিধত্ব করছে, তাদের বোঝাতেও এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। মুসলিম শিক্ষাবিদদের পাশ্চাত্য চেতনায় বিশ্বাসী লোকদের বোঝাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে তারা যা জানে না, তা তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি কখনও এসব লোকের চেতনা ইসলামে প্রশিক্ষিত হত এবং ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মহিমা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হত, তাহলে তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য রক্ষক এবং অধিবক্তা হয়ে যেত। আমি দেখতে চাই, যারা ইউরোপীয়ান শিক্ষা পেয়েছে তাদেরকে মুসলিম শিক্ষাবিদরা প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক দিন বুঝাচ্ছেন। তারা আলোচনা করছেন ইসলাম ও ইউরোপীয় আইনের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যের ব্যপ্তি নিয়ে এবং যারা অনৈসলামিক আইন প্রতিষ্টা করে সেসব লোকদের প্রতি ইসলামের বিধান কি সে ব্যাপারে। আমাদের অবশ্যই এটা ভুললে চলবে না যে, যারা ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছেন তারা এখনও মুসলিম। যদিও তারা ইসলামের কিছু বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে যা জানে না, তা শিখতে তারা বন্ধুভাবাপন্ন।

আমি এটাও দেখতে চাই, যারা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের ইসলামী শরিয়া পড়তে সক্রীয় করছেন। এর প্রত্যাদেশ পরিচিত করাচ্ছেন। এর নীতি মতবাদ এবং মানব তৈরি আইনের উপর এর উৎকর্ষতার ব্যাপারে নিশ্চিত করছেন। একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বোধহয় তারা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। যে কমিটিতে থাকবেন ভিন্ন চিন্তাধারা ও

মাযহাবের প্রতিনিধিরা। প্রত্যেক কমিটি প্রত্যেকটি মাযহাবের সমস্ত বই এবং লেখা জমা করবে এবং পরে তা আধুনিক ভাষায় সম্পাদনা করে একটি বইয়ে সংকলন করবে। নতুন আঙ্গিকে একটি সূচী তৈরি করবে। অথবা নতুন বই লিখে সমান লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। যা হবে চলমান ভাষা ও আঙ্গিকে। যাতে বিভিন্ন মাযহাবের উপর তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইন ও বিধানকে অতি আকর্ষনীয় পন্থায় উপস্থাপন করা হবে। এভাবে একটি গ্রন্থ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। অন্যটি হবে ট্যাক্সের বিষয়ে। তৃতীয়টি হবে পার্টনারশীপ ও অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারে। চতুর্থটি হতে পারে ঋণখেলাপী এবং দেওলিয়াপনার ব্যাপারে। এভাবে আরও অনেক বিষয় হবে।

অধিকন্তু, আমি চাই, মুসলিম শিক্ষাবিদরা শাসক ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে বুঝাচ্ছেন, ইসলামের বিধানের সাথে যেসব আইনের বৈপরীত্য সেসব আইনের প্রতি ইসলামের কী মনোভাব। যেসব লোক এসব রায় পাস করে এবং জারি করে তাদের প্রতি ইসলামের কী রায়।

এছাড়া আমি এও দেখতে চাই যে, মুসলিম শিক্ষাবিদরা দেখবেন যে, কোনো নতুন আইনই যেন তাদের পরামর্শ ও তত্তাবধান ছাড়া প্রণয়ন না করা হয় এবং ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো নতুন আইনই জারি করা না হয়।

ও মুসলিম শিক্ষাবিদেরা : হুশিয়ার হোন, মুসলিম দেশগুলোর একমাত্র সংকট ইসলামের আইন ও নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ শাসকশ্রেণী এবং অজ্ঞ সাধারণ মুসলিমরা। এই পরিস্থিতি শুদ্ধ করার একমাত্র পথ হলো যে, এদেরকে ইসলামের সবকিছু শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেক দলকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেভাবে তারা অভ্যস্ত। কোনো বিশ্বাসী মুসলিমই ধর্ম তাকে যা শিক্ষা দেয় সে ব্যাপারে যা সে জানে না, তা শিখতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। তবে ইউরোপীয় শিক্ষিতরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে তাদের তুচ্ছজ্ঞান করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধুমাত্র বাস্তবতা বর্ণনা করেছি। আমি তো নিজেই তাদের একজন। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করার পূর্বে আমি তাদের মতই অজ্ঞ ছিলাম। হয়তো, ইসলামী শরিয়াকে অগ্রাহ্য করতে তাদের চেয়েও আরও চরম ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ স্থির করলেন যে, আমি আমার এই পড়াশোনা ভালো কাজে রুপান্তর করব। আমার সামনে সেই সীমা প্রকাশ করলেন যা একজন ব্যক্তিকে তার অজ্ঞতার কারণে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। আমি চাই না, আমার সাথী ভাইয়েরা এরকম নেতিবাচক অবস্থায় পড়ে থাকবে, যে অবস্থায় আমি ছিলাম। এজন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট তাওবাহ করতে থাকি।

আমি যদি আমাদের মুসলিম শিক্ষাবিদদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিচালন ও ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি, এটা তাদেরকে অবহেলা করে কিংবা দোষারোপ করার মাধ্যমে নয়। এটা হল মাশওয়ারা বা পরামর্শ, যা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা মূলত আমার অভিজ্ঞতা এবং যারা ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছে তাদের সাথে আমার চলাফেরা করার কারণে এটা

আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, পুরো উৎসাহ ও আন্তরিকতার সাথে সমস্ত জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া হল ইসলামের জন্য সবচেয়ে হিতকর কাজ। বিষয়টি এখন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের উপর নির্ভর করে যে, তারা আমার মতামত গ্রহণ করবেন অথবা চিরতরে উপেক্ষা করে যাবেন।
আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান যে পথ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উত্তম।

এই দশার জন্য কে দায়ী?

আমাদের বর্তমান এই অবস্থার জন্য এবং ইসলামের বাস্তব হালের জন্য সব মুসলিমরা দায়ী। এই দায়ের ভার সকলের ঘাড়ে। হয়তো এই দায়িত্ব সমাজের এক দলের চেয়ে অন্য দলের উপর ভিন্ন। কিন্তু এই ভোগান্তির দায় কেউ এড়াতে পারবেন না। যা এসেছে, অজ্ঞতা, জঘন্য কাজ, অবিশ্বাস, গুরুত্বদানের স্থানচ্যুতি এবং অপমান, দারিদ্রতা ও শোষণ, ঔপনিবেশিকতা ও দখলদারিত্ব থেকে।

জনসাধারণের দায়

আজকের ইসলামের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সাধারণ মুসলিমরা দায়ী। সাধারণ মানুষ যদি তাদের ধর্মের প্রতি অজ্ঞ না হত, তাহলে ইসলাম বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় নিশ্চয় থাকতো না। তারা ক্রমশ বিচ্যুত হতো না এর অনুশাসন থেকে। তাদের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা নিজেদেরকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন ইসলামের নীতি থেকে। যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে অসচেতন।

সাধারণ মুসলিমরা মন্দকাজে এতই অভ্যস্ত হয়েছে যে, নাস্তিকতা ও মূর্খামীকে তারা খুব কমই বিবেচনায় আনে যে, এসবের চর্চা ইসলামবিরোধী। অথবা তারা বিশ্বাস করে, সংগ্রাম করে এসব স্খলনকে অতিক্রম করার ব্যাপারে ইসলাম পরোয়া করে না বা এ বিষয়ে ইসলামের কোনো উদ্বেগ নেই।
যাইহোক, ইসলাম তার শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় করেছে এবং তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে। এর নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم

‘তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে।’ (সূরা তাওবা, আয়াত : ১২২)

কার্যত কিছু নিষ্ঠাবান দল সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও তাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম সরকার এসব দলের সাথে লড়াই করার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তারা এসব মানুষদের ইসলামী বিধিবিধান পালনে বাধা দেয় এই আশায় যে, এসব অন্যায্য কাজের মাধ্যমে তার উপনিবেশবাদীদের অনুকম্পা লাভ করবে। অথবা একনায়কদের মর্জির অনুবর্তী হতে তারা এসব করে। এভাবে তারা ইসলামের শত্রুশিবিরে যোগদান করে। জনসাধারণ বংশবদের মতো তাদের সরকারের মনোভাবের প্রতি রুজু হয়, যখন তাদের উচিত ছিলো প্রবলভাবে প্রতিবাদ করা। আর এভাবেই ইসলামের চেতনাকে শ্বাসরোধ করতে এবং এর প্রচারকদের ধ্বংস করতে জনসাধারণ একাজে অংশগ্রহণ করে।

সাধারণ মুসলিমরা তাদের উচ্চ গৌরব, মর্যাদা ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তারা বর্তমানে ক্রীতদাসের মতো সেইসব দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ক্ষমতাবানদের, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ও শাসকদের পদলেহী হয়ে জীবনযাপন করছে যারা তাদের জীবনের স্পন্দনটুকুও লুণ্ঠন করেছে। তাদের সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত করেছে। তাদের ইজ্জত লুটেছে এবং তাদের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করেছে। সর্বকালে মুসলিমদের পতনের মূল কারণ হল নিজেদের ধর্মকে পরিত্যাগ করা। যে ধর্ম তাদের দান করে খ্যাতি ও গৌরব। যদি কখনও তারা তাদের মুখ এর অভিমুখী করে, তাহলে তারা তাদের এই বলহীন অবস্থাকে পাল্টাতে এবং তাদের আহত মর্যাদাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

সাধারণ মুসলিমরা অপরিনামদর্শীতার এক সর্বনাশা পথ অতিক্রম করছে। তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অমনোযোগী। এমনকি তারা অমনোযোগী জাগতিক জীবন এবং নিজেদের ব্যাপারেও। যখন তারা সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা তাদের বর্তমান জীবনের অপচয় করছে। আখেরাতের সম্ভাবনাময় সুখের বিসর্জন দিচ্ছে। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার প্রতি অমনোযোগীতা ও উপেক্ষার মাধ্যমে এবং কুরআন থেকে বিচ্যুতির মাধ্যমে তারা আখেরাতকে বিসর্জন দিচ্ছে।

মুসলিম সরকারগুলো দায়

মুসলিম সরকারগুলো ইসলামের মানহানী এবং হীন জটিলাবস্থা ও আইনহীনতার জন্য সর্বাধিক দায়ী। তাদের কর্মকান্ড মুসলিমদের দুর্দশাগ্রস্ত করেছে।
এসব সরকারগুলো ইসলামকে জাগতিক কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা মানুষের উপর আরোপ করেছে। আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন তার অবাধ্য হয়ে তারা জনগণকে শাসন করছে

মুসলিম সরকারগুলো জনগণ তথা মুসলিমদের ইউরোপের পাপের দিকে পরিচালনা করছে। তারা সরে পড়েছে আল্লাহর দেওয়া ন্যায়পরায়ণতা ও সত্য পথপ্রদর্শন থেকে। তারা নিজেদের উপর মানব তৈরি আইন আরোপ করেছে। স্বাভাবিকভাবে যেসব ভালো কাজ তাদের নিজেদের ইসলামী শরীয়ার আবেদন থেকে উদ্ভুত তা তারা প্রত্যাখান করছে।
মুসলিম সরকারগুলো সার্বভৌমত্ব, রাজনীতি এবং প্রশাসনে ইসলামের লংঘন করছে। স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়কে রহিত করার মাধ্যমে ইসলামী নীতির সীমালংঘন করেছে। ইসলাম যা নির্ধারিত করেছে, তা তারা ত্যাগ করেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে সহযোগীতা ও সমবেদনাকে নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে, তারা তার অনুমোদন দিয়েছে। সমান সময়ে তারা সমাজে অবিচার, বিদ্বেষ, শোষন এবং সামন্ততন্ত্রের লালন করছে। তারা মুসলিম সমাজে দূর্নীতি, অধ:পতন, ভ্রষ্টতা, দুরাচার, আমিত্ব ও নিপীড়নের মাধ্যমে সমাজকে জগাখিচুরী করেছে।

মুসলিম সরকারগুলো মুসলমানদের নিজেদের ধর্ম শিখতে, আপন রবের ইবাদত করতে এবং তাদের পবিত্র কর্তব্য পালন করতে বাধা দিচ্ছে। ইসলাম যেখানে তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে, সেখানে তারা ইসলামের শত্রুদের নিকট আনুগত্য দিচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণের সাথে যা সম্পর্কযুক্ত সেসব ব্যাপারে তারা নীরবতা পালন করে।

এসব মুসলিম সরকারগুলো নিজেদের জনগণের উপর দূর্বলতা ও অপমান চাপিয়ে দিয়েছে। শোষণ এবং দারিদ্রতা জনগণের কাঁধে চাপিয়েছে। সয়লাব ঘটিয়েছে নীতিহীনতা এবং অসচ্ছরিত্রার।

মুসলিম সরকার প্রধানদের দায়

ব্যক্তি হিসেবে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা হলো সেসব লোক যারা ইসলামের পতনের জন্য সর্বাধিক দায়ী। যদিও মানব তৈরি আইন তাদেরকে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে ছাড় দেয় কিংবা দোষী সাব্যস্ত করে না। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে প্রত্যেক ভুল কিংবা খারাপের দায়ভার থেকে মুক্তি দিবে না। গুরুতর কিংবা মামুলি যার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। সত্যিকারর্থে, আমাদেরকে এসব শাসকদের মোকাবেলা করতে হবে জীবনের বাস্তবতা দিয়ে এবং এর ফ্যাক্টের ব্যাপারে তাদের চোখ খুলে দিতে হবে।

হে সরকার প্রধানগণ : আপনাদের দেশের শাসন ও সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব আপনাদের হাতে। আপনাদের নিয়ন্ত্রণে হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা। ইসলামকে তার ন্যায্য অবস্থানে পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী আপনারা। আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেই উত্তরাধিকার পেয়েছেন, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আপনারা সেই উত্তরাধিকার অনুযায়ী চলা

পছন্দ করেছেন। আপনাদের ক্ষমতার দ- সেটার উপর প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামকে লংঘন করেছেন। হয়তো এ বিষয়ে আপনারা সচেতন কিংবা অসচেতন।
উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এসব লিগ্যাসী হল প্রাথমিক উপাদান যা আমাদের ইসলামকে দূর্বল করেছে এবং মুসলমানদের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে। জেনে রেখুন, ইসলামের দূর্বলতা আপনাদের উপরই প্রতিফলিত হবে কিন্তু এর শক্তিমত্তা আপনাদের সাহায্য যোগান দিবে। একটি দূর্বল রাষ্ট্রের রাজা, যুবরাজ কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অনেক বেশি শ্রেয়। এতে আপনাদের স্বার্থ আরও বেশি প্রতিফলিত হবে। আর দূর্বল রাষ্ট্রের রাজা হলে আপনি মূলত ঔপনিবেশ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী দারা পরিচালিত হবেন। যারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কলকব্জা ধ্বংশ করে অথবা প্রভাবিত করে। এর কর্মকর্তাদের নিয়োগ কিংবা বরখাস্ত করে। তারা ক্ষমতার গদি নাড়িয়ে দেয় এবং শাসকদের প্রতি চোখ রাঙ্গায়।

হে সরকার প্রধানরা : আপনারা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত। আপনাদের কাজ হলো নিজেদের বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা। আপানার পরস্পর বিরোধীতা ও সংঘাতে লিপ্ত। আপনাদের উচিত হলো, একে অন্যের সাথে হাতে হাত মিলানো এবং একে অন্যের সহকর্মী বনে যাওয়া। এতে আপনাদের ও ইসলামের স্বার্থ রক্ষা হবে। এটা আপনাদের জন্য এবং ইসলামের জন্য অনেক ভালো হবে। সর্বপ্রথম আপনারা মুসলিম। সুতরাং ইসলামকে সবকিছুর ঊর্ধে রাখুন। নিজেদের আত্মসমালোচনা নিজেরা করুন। এটাকে আপনাদের শাসনের বুনিয়াদ হিসেবে রেখে এর উপর ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলুন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পথে নিজেদেরকে নড়বড়ে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবেন না। কেননা আপনারা মরণশীল এবং নিশ্চিতভাবে আপনারা মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যুর পর জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনাদের কেউই রাজ্য, সম্পদ ও বংশ দ্বারা উপকৃত হবেন না। আপনাদের ভালো কাজ এবং আল্লাহর ওয়াস্তে যে সেবা করেছেন তাই গণনায় আসবে। আপনাদের জন্য তো এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে, ইতিহাসে আপনারা এমন এক শাসক হিসেবে গণ্য হবেন, যারা ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী আইন পুন:প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করেছে। যারা নিজেদের মসনদ ও অনাবিল প্রাচুর্যের কারণে এবং অনমনীয় আসক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা কিংবা বিলম্ব করায়নি। যা ইসলাম এবং মুসলমানদের কাছে সমানভাবে অগ্রহণযোগ্য।

সকল সমস্যার সুরাহা করতে আপনাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট। আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লোভকে পরাস্ত করার শক্তিশালী ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুর দরকার নাই। আপনারা যদি এমন অটল ক্ষমতা ও দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারি হন, তাহলে আপনারা অন্য সবকিছু জয় ও অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের লক্ষ্যের প্রতি মুখোমুখি হতে লজ্জাবোধ করেন। ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ এবং ক্ষমতা ও জাকজমকের প্রলোভন বাদ না দেন, তাহলে মুসলিমরা বিভক্ত, অপদস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্বল হতে থাকবে। এভাবে আপনারা এবং আপনাদের মুসলিম জনগণ শক্তিশালী অমুসলিম রষ্ট্রগুলোর দ্বারা অনুগত এবং অপদস্থ হতে থাকবে। ঔপনিবেশিক ও দুশ্চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত হতে থাকবে। আপনারা এবং আপনাদের মুসলিম

নাগরিকরা পুতুল ও ছায়ার মতো ‘বড় শক্তির’ দ্বারা ভুলে পথে চলবে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। যারা আপনাদের মেকি সমর্থক হওয়ার মাধ্যমে শোষণ ও উপহাস করে। তারা ভালো করেই জানে, ক্ষমতা টিকে থাকে ঐক্যের উপর এবং বিজয় তাদের সাথে থাকে যারা ক্ষমতার অধিকারী।

হে সরকার প্রধানরা : নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ পদ, সম্ভ্রান্ত উপাধি ও রত্নখচিত রাজমুকুটের মধ্যে আকঁড়ে থাকবেন না। কেননা এসব প্রবলপ্রতাপ অযোগ্যদের ক্ষমতায় পড়ে থাকার আগ্রহ মুসলিম দুনিয়ার অধ:পতনের জন্য দায়ী ছিল। তারা দায়ী ছিল ইসলামের চেতনাকে স্তব্ধ করতে। দুর্বল রাজ্যে বিভাজন করতে। তারা দায়ী ছিল ক্ষুদে রাষ্ট্রে বিভক্তি, অরক্ষিত ও অসহায় শাসনের জন্য। মুসলিমরা প্রমাণ করেছে, যদিও তাদের সংখ্যা প্রচুর, তাদের ভূমির বিশালতা, বস্তুগত (খনিজ) সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনশক্তি থাকা স্বত্তেও এবং সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকার পরও তারা প্রমাণ করেছে তারা এই পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্বলের চেয়েও দূর্বল। সবচেয়ে বেশি অপদস্থ এবং অন্যান্য জাতির নিকট সবচেয়ে বেশি অসম্মানিত।

আপনারা যদি প্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন নিজেদের স্বার্থ, পদ, খেতাব এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে, তাহলেও আপনাদের অবশ্যই যে কোনো পরিস্থিতিতে একত্রিত হতে হবে। আপনাদের দেশগুলোর বাহিনীকে একত্রিত করতে হবে, যাতে মুসলিমরা একটি বাহিনীতে একত্রিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করতে পারে।

হে সরকার প্রধানরা : আপনাদের এই পদ, পদবী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সামনে কোনো কাজেই আসবে না। যিনি আপনাদের এবং আপনাদের পূর্বসূরীদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যা আপনাদের ভূমিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত ছিল। তিনি আপনাদেরকে মুসলিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন, যাদের একতা আপনারা ভঙ্গ করেছেন। যাদের ক্ষমতা আপনারা ধবংস করেছেন। যাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিস্বত্তা আপনারা কেটে বিভক্ত করেছেন। তাদেরকে বিতর্কের প্রতীক বানিয়েছেন। তাদের শক্তি নিঃশেষিত করেছেন। তাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং লালসা দিয়ে লাঞ্চিত করেছেন, যা একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষকে লজ্জা দেয় এবং অপমানিত হয়ে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য করে।

হে সরকার প্রধানরা : ক্ষমতা এবং কর্তিত্ব আঁকড়ে থাকবেন না। স্বরণ করুন রাসূল (সা.) বলেছেন:

أنكم ستحرصون على الإمارة و ستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة

দেখুন ক্ষমতা হল একটি বিশ্বাস। যে ব্যক্তি বৈধভাবে তা হস্তগত করবে এবং এর যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করবে, সে আখেরাতে বাঁচতে পারবে। এর দায়িত্ব তার ন্যায্য মালিকের নিকট পেশ

করুন। কেননা আল্লাহ এজন্য আখেরাতে আপনাদের দায়ী হিসেবে ধরবেন। রাসূল (সা.) আবু যর (রাযি.) কে দেওয়া পরামর্শ মনযোগ দিয়ে ধরুন। যখন তিনি রাসূলের কাছে তাকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন :

يا ابا ذر انك ضعيف و انها أمانة ، و انها يوم القيامة خزي و ندامة الا من اخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها

'হে আবু যর! তুমি নম্র। এটা (সরকারি দায়িত্ব) হল একটি ওয়াদা, যা কেয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হবে। যে তা গ্রহণ করবে সে ব্যর্থ হবে, যদিনা সে তা বৈধভাবে দখল করে থাকে এবং এর সকল দায়িত্ব পূর্ণ করে।'

মুসলিম শিক্ষাবিদদের দায়

মুসলিম শিক্ষাবিদরাও (উলামা) আমাদের এই অগ্নিপরীক্ষা এবং ইসলামের এই দূর্দশার জন্য দায়ী। তারা ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট পাপ ও নষ্টামীর জন্য দায়ী। তারা শাসক ও সরকারের দ্বারা সৃষ্ট পাপ এবং জনসাধারণ যারা মূর্খ তাদের এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তাদের পাপের জন্য দায়ী।

এই আলেমরা এসব দোষারোপের উপযুক্ত, কেননা তারা সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছেন, অথবা কমপক্ষে এর জুলুমের সামনে নীরব থাকেন। তারা অনৈসলামিক শাসনকেও মাঝে মধ্যে সমর্থন করেন এবং কখনও আপোস করে চলেন। তারা জনসাধারণকে ইসলামের মৌলিক নীতির ব্যাপারে অজ্ঞতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে গঠিত চক্রান্তের ব্যাপারে অসতর্কতার মধ্যে ফেলে রেখেছেন।

আলেমরা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, কেননা তারা ব্যর্থ হয়েছেন জনসাধারণকে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপারে ইসলামের রায় জানাতে। তারা ব্যর্থ হয়েছেন সরকারকেও এই রায় জানাতে, যারা ওই শক্তিগুলোকে সহায়তা, ট্যাক্স এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে সাধারণ মুসলিমরা প্রো-কলোনিয়ালিষ্ট সরকারের অনুবর্তী হয়। ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে মুসলিম শিক্ষাবিদ এবং সাধারণের নীরবতার কারণে। অন্যকথায় তারা ধর্মকে পরিত্যাগ করার কারণে এরকম ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। জনগণ হয়তো এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারতো, কেননা তারা বিশ্বাস করতো, মুসলিম শিক্ষাবিদরা কোনো কিছুই অনুমোদন করতো না, যদি না তা ইসলামের শিক্ষার ও আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুসারে না হত।

মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। মুখে তারা কুলুপ দিয়েছেন । আর কানে দিয়েছেন আঙ্গুল। ইসলামের কথা ভুলে তারা শত বছর ঘুমিয়ে রয়েছেন আর এমন অবস্থায়

মুসলিমরা তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় অনুসরণ করছে। জনগণ এই বিশ্বাসে অনুসরণ করছে যে, তাদের ইসলাম ছিল সেইফ এবং সাউন্ড। অন্যথায় তাদের আলেমরা কখনও নীরব থাকতেন না।
দীর্ঘকাল থেকেই মুসলিম শিক্ষাবিদরা ইসলামকে উপেক্ষা করেছেন। তারা কখনও ইসলাম অবমাননার কোনো কার্যের নিন্দা করেননি। কিংবা তারা ইসলামী নীতির বিপরীতে চালু হওয়া কোনো অনুশাসনকে প্রত্যাহার ও নাকচ করতে চেষ্টা করেননি। তারা কখনও ইসলামী শরিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে একটি সমাবেশে মিলিত হননি।

শাসকরা যখন গুরুতর অপরাধ করেছে, অবৈধকে অনুমোদন করেছে, রক্ত ঝড়িয়েছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, নষ্ঠামির বিস্তার ঘটিয়েছে, এবং আল্লাহর দেওয়া সীমা অতিক্রম করেছে, এমতাবস্থায় শিক্ষাবিদরা এসব কাজের যথোচিত বিদ্ধাচরণ ও ধীক্ষার জানাননি। তারা শুধুমাত্র নীরবতাই অবলম্বন করেছেন, যেন ইসলাম তাদের কাছে দাবি রাখেনি, অন্যদের সৎকাজে আহবান করতে ও অসৎকাজে নিষেধ করতে। তাদের উপর যেন আবশ্যকীয় করা হয়নি, শাসককে পরামর্শ দিতে, যাতে তারা ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করে।
মুসলিম দেশগুলো যখন বিদেশী শক্তির দ্বারা অধিকৃত হলো তখন আমাদের আলেমরা এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি। এমনকি তারা জনগণকেও বলেননি যে, আক্রামণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দখলদারদের প্রতিরোধ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহয় কী বক্তব্য আছে। যারা এসব আক্রমণকারী ও উপনিবেশবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বক্তব্য দিয়েছে। মুসলিম আলেমদের একটি দায়িত্ব ছিল অমুসলিম আক্রমণকারীদের বয়কট করা। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের বন্ধু ও মিত্রশক্তি বনে যায়। এমনকি তারা অধিকৃত দেশের প্রতিনিধিদের বাসস্থানে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পর্যন্ত পালন করতে থাকে!

মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী নীতির সাথে সাংঘর্ষিক মানব তৈরি আইন জারি হলো। ইসলামের হুকুম বাতিল করা হলো। আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা হলো এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা হলো। তবুও মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের ধর্মের এই লংঘনে উত্তেজিত হলেন না। তারা তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও শংকিত হলেন না। যদিও তারা ইসলাম বেচে তাদের জীবিকা অর্জন করলেন। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য এবং তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলীর দুঃখজনক আবর্তনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো সমাবেশেরও আয়োজন করলেন না।

সর্বব্যাপী ব্যভিচার ও কামুকতা বিস্তার লাভ করলে। পতিতালয় ও নৃত্যশালা খোলা হল। সরকার মুসলিম নারীদের পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স দিল। মানুষ প্রকাশ্যে ইসলাম অমান্য করলো। তা স্বত্তেও আমাদের শিক্ষাবিদরা নিজেদের সংযত রাখলেন এবং এসব নোংরা কাজের ব্যাপারে ‘দুঃখপ্রকাশ’ এর বেশি আর কিছুই করলেন না।

যখন ধর্মনিরপেক্ষতা (সেক্যুলারিজম) প্রতিষ্ঠিত হলো, যা ধর্মীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করে। আমাদের মুসলিম শিক্ষাবিদরা সর্বপ্রথম তাদের বাচ্চাদের সেখানে দিলেন। যখন খৃষ্টবাদের প্রচার ও মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরাতে মিশনারি স্কুল খোলা হল, আমাদের মাথার তাজ সম্ভ্রান্ত শিক্ষাবিদরা তাদের মেয়েদেরকেও সেখানে ভর্তি করালেন। যাতে তারা বিদেশী ভাষা, নৃত্য এবং খৃষ্টবাদ শিখতে পারে।

যখনই কোনো সরকার কোনো মারাত্মক সমস্যায় পড়ত, তারা এসব প্রতারক শিক্ষাবিদদের বাগিয়ে নিতো। যারা কখনও 'তাদের সরকারকে মানতে' মুসলিমদের নিলাম করতে ব্যর্থ হয়নি। যদিও এই সরকার মদ, ব্যভিচার, সুদ, নাস্তিকতা ও নষ্টামির অনুমোদন দিয়ে থাকে। যদিও এরা তাদের জনপ্রিয় খোশখেয়াল ও দলীয় শৌখিনতার কারণে ইসলামকে খারিজ করে থাকে।

এসব কার্যকলাপ এত লম্বা সময় ধরে চলতে থাকল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে বসলো যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদের ইসলামে ঠিকে থাকার জন্য কোনো প্রতিবন্ধক নয়। এতে ইসলামের কোনো বিধান লংঘিত হচ্ছে না। আশ্চর্যের কিছু নেই, তারপর অন্যায় ও দুর্নিতিগ্রস্থ কাজে আমাদের জীবন ভড়ে উঠল। আর এর প্রতিকারের প্রচেষ্টা প্রায় অকার্যকর হয়ে গেল। এসব ঘটল, মুসলিম পন্ডিতদের দূর্বলতার কারণে এবং ইসলামী শরিয়া প্রয়োগের বিষয়ে তাদের পাপাচারী মনোভাবের কারণে।

সত্যিকার আলেমরা হলেন রাসূলের ওয়ারেস। এটা আলেমদের জন্য খুবই বেমানান যে তারা রাসূলের এই উত্তরাধিকারের প্রতি এমন ধৃষ্ট আচরণ দেখাবেন। ইসলাম তাদের উপর এই কর্তব্য আরোপ করেছে যে, মানুষকে ভালো কাজ সম্পাদনের আদেশ দিতে হবে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। আলেমরা যদি এই দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে নিতে প্রত্যাখান করেন, তাহলে কে এই ভার গ্রহণ করবে?

হাস্যকর ব্যাপার হলো, মিশরের শিক্ষাবিদরা পরবর্তীতে তাদের গলার সুর ফিরে পান এবং তারা তাদের দীর্ঘ নীরবতা চূর্ণ করেন। তারা সমাবেশে জমায়েত হয়ে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের আহবান জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাদের এই বক্তব্য কি ইসলামের জন্য এবং তার শরিয়া বলবৎকরনের জন্য ছিল? মোটেই তা নয়; তারা বিদ্রোহ করেছেন এবং অন্যদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছেন তাদের পদ, ভাতা, বেতন ও কায়েমী স্বার্থের কারণে। তারা ইশতেহার প্রকাশ করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন। যা ভরপুর ছিল কুরআনের আয়াত ও হাদিসের উদ্ধৃতি দ্বারা। এসব তারা করেছেন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থে এবং স্বতন্ত্র সম্মান বজায় রাখতে। তারা এসব ইসলামের জন্য করেননি। তাদের কাছে নিজেদের গুরুত্বের চেয়ে ইসলামের গুরুত্ব ছিল কম এবং তাদের কাছে ইসলামের মর্যাদার চেয়ে তাদের মর্যাদা ছিল বেশি। এটা খুবই বেদনাদায়ক ছিল, যখন দেখা গেল, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের সমাবেশে ইসলামী সহানুভূতির ডাক দিলেন। চেষ্টা করলেন এই বিদ্রোহকে সত্যিকার

ইসলামী সংস্কারের দিকে পরিচালনা করতে। এমতাবস্থায় তাদের সহকর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাদের প্রত্যাখান করলেন এবং তাদের প্রয়াসকে বানচাল করলেন। এটাই তখন প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, এই শিক্ষাবিদদের কাছে ইসলাম পুনরুজ্জীবনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা! আপনারা জাতি ও সরকার দ্বারা লাঞ্চিত এবং উপেক্ষিত হয়েছিলেন। কেননা আপনারা নিজেদের ধর্মের প্রতি মনযোগী হননি এবং তা উপেক্ষা করেছেন।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা ! আপনাদের মর্যাদা কেবলমাত্র ইসলাম থেকে আসে। আপনাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা একমাত্র ইসলামই প্রদান করে।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা! ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতিও নেই যে, আপনারা আল্লাহর আইনের কথা বলতে ও নির্দেশনা দিতে আপনাদের জিহ্বাকে সংযত রাখবেন। আপনারা আল্লাহর শত্রুদের দিকে চোখ বন্ধ রাখবেন, যারা তার বিচারিক সিদ্ধান্তের নীতিগুলোকে কলুষিত করেছে। ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতি নেই যে, আপনারা ছাত্রদের ইসলামী আইন শিক্ষা দিবেন; কিন্তু সরকারে তা বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতি নেই যে, আপনারা মসজিদে দাঁড়িয়ে মানুষকে ভালো আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের ডাক দিবেন, এমতাবস্থায় তাদেরকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে রাখবেন। তাদের বলবেন না, রাজনীতি, সরকারি প্রশাসন, আইন প্রনয়ণ, ন্যায়বিচার, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, মিত্র এবং যুদ্ধরতদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে। কেন আপনারা মানুষকে তাদের ধর্ম পুরোপুরি শিক্ষা দেন না। আপনাদের পেশার দাবি তো তাই।

আপনারা কেন মানুষদের বলেন না, আক্রমণাত্মক দখলদার এবং আগ্রাসী হামলাকারীদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? যারা আক্রমণকারীদের সহযোগীতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? আর যারা এরকম শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, বিদ্রোহ করে, তাদের ব্যাপারে হুকুম কী?

আপনারা কেন মানুষকে বলেন না, যারা মুসলিমদের উপর তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কিছু আরোপ করে, সেসব লোকদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? ইসলাম কি এসব লোকদের আনুগত্য এবং তাদের কর্তিত্ব মেনে নিতে বিধান দেয়। অথবা ইসলাম কী এসব লোকদের অবাধ্য হতে এবং তাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কোনো বিধান দেয়?

আপনারা কেন মানুষের সামনে ঘোষণা করেন না, ইসলাম মুসলিমকে মানব তৈরি আইন মেনে নিতে নির্দেশ দেয়, না তা অস্বীকার করতে নির্দেশ দেয়?

আপনারা কেন মানুষের সামনে দৃঢ়সংকল্পতার সাথে স্পষ্ট করেন না, সম্পদ, শোষণ ও একাধিপত্যের ব্যাপারে ইসলামের রায় কী? বর্তমান আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ইসলামের রায় কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

আপনারা কেন মানুষকে অবহিত করেন না, ইসলামের সে বিধান। যা নিষিদ্ধ করেছে অত্যাধিক সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে এবং সর্বনাশা দারিদ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে।

আপনারা কেন উচ্চকণ্ঠে তাদের নিয়তির ব্যাপারে ইসলামের রায়ের কথা ঘোষণা করেন না, যারা ইসলামের প্রচারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেন ঘোষণা করেন না, ইসলামের জন্য যারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে, তাদের নির্যাতনকারীদের যারা সহায়তা করে তাদের ভাগ্যলিপিতে কী সংরক্ষিত আছে।

আপনারা কেন নির্ভয়ে ব্যাখ্যা করেন না, সেসব লোকদের প্রতি ইসলামের অবস্থান কী যারা স্বেচ্ছাচারী রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামের মানদন্ড থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ইসলাম কী বিশ্বাসীদের এসব অনধিকারচর্চার ব্যাপারে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়, না এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং তা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।

আপনারা কেন পরামর্শ এবং ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে ইসলামের নীতি মানুষের জন্য সরল করে দেন না। এগুলো কি সারাজীবন একবার প্রতিপাদিত করলেই হবে। অথবা দুটিই হলো বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না এর প্রয়োজন আছে। যাতে এভাবে মানুষকে সবসময় ইসলামী আইন স্বরণ করিয়ে দেওয়া যায়।

আপনারা কেন মানুষকে আগ্রহচিত্তে উপদেশ দেন না, সেসব মহামূর্খদের ব্যাপারে ইসলামের রায় কী, যে তার নিজের জন্য সম্মান দাবি করে কিন্তু ইসলামের জন্য সম্মান দাবি করতে অস্বীকার করে।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা! আমি স্বীকার করি, আপনাদের মধ্যেও একটি ছোট এবং সম্মানিত দল আছে, যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করে এবং এর শিক্ষাকে মেনে চলে। আমিও এও স্বীকার করি যে, আপনাদের মধ্যে কিছু লোক কুরআনের নীতি প্রতিষ্ঠায় তাদের সময়, শক্তি এমনকি জীবনও বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রতিরোধের তোয়াক্কা করেননি। কিন্তু এরা সংখ্যায় অবশ্যই নগন্য এবং তারা অবশ্যই আপনাদের সাথে শ্রেণীভুক্ত হতে ঘৃণা করবে। এই স্বল্পসংখ্যক ভালো ও সদাশয় মানুষের কার্যক্রম আপনাদের পাপের ক্ষতিপূরণ করবে না। শাস্তিও প্রশমিত করবে না, যা আপনাদের গাফলতি এবং লোলুপতার মাধ্যমে অর্জিত।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা! এই ন্যায়নিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র লোকদের উদাহরণ অনুসরন করুন। তাদের পদচিহ্ন অনুসরন করুন। ইসলামের জন্য কিছু একটা করুন। আপনাদের দীর্ঘ নীরবতা এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট হয়েছে। এখন শুধু ইতিবাচক কর্মে আপনাদের ও আপনাদের ধর্মের ভালো নিহিত আছে।

সুত্র: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন।